**যুবক জীবন – ডা. লুৎফর রহমান**

**০১. কথা আরম্ভ–যৌবনের ঔদ্ধত্য**

যৌবনকালে যুবকদের মনে অহঙ্কার এবং ক্রোধ সর্বদাই লেগে থাকে। নিজে যেন সে একটা মস্ত বড় দরের মানুষ। পরের সামান্য প্রতিবাদে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠা তার স্বভাব।

একবার একটা যুবক টাকা ভাঙ্গাবার জন্য এক সরকারি অফিসে যেয়ে উপস্থিত হন। সরকারি অফিসে কখনও টাকা পয়সা দেওয়া হয় না। তথাপি যুবক যখন টাকা পয়সা পেলেন না তখন তার ক্রোধের সীমা রইলো না, তিনি সমস্ত রাজকর্মচারী সমাজকে গালি দিতে আরম্ভ করলেন। যুবকের যে এটা অন্যায় জিদের দাবি, সে কথা ভাববার সহিষ্ণুতা কী তার ছিল?

ধীরচিত্তে বিবেচনা করবার স্বভাব যুবকদের মোটেই নাই। এক সভায় কতকগুলি যুবক ছিলেন। তারা একত্রে দশ-বার জন ছিলেন। ভাব প্রকৃতি দেখে মনে হচ্ছিল, বোধ হয় তারা কোনো রাজ্য জয় করতে বেরিয়েছে বা কোনো পাহাড় ভেঙ্গে গুড়ো করতে যাচ্ছেন। সেই রাস্তা ধরে অপর দিক থেকে এক পথিক আসছিল-যুবকদের নিকটে আসতেই একজন ধাক্কা মেরে ক্লান্ত পথিককে পার্শ্বের ড্রেনের ভিতর ফেলে দিল। পথিক ক্রুদ্ধ হয়ে বল্ল"তোমরা কি কানা? অমনি যুবকেরা সমস্বরে আগুন হয়ে বল্লে–ব্যাটার তো ভারি তেজের কথা। নিজে এসে গায়ের উপর পড়লেন,–এখন উল্টো দাবি করছেন। পথিক যদি আর একটু প্রতিবাদ করতেন, তা হলে যুবকদের হাতে তাকে অপদস্থ হতে হত নিশ্চয়।

যুবকদের গায়ের জোরে আস্থা খুব বেশি। বিচার-বুদ্ধি, বিবেকের দাবি তাদের কাছে নাই। ঔদ্ধত্য প্রকাশ তাদের স্ব-প্রকৃতি।

যুবকেরাই যুদ্ধের যোগ্য।–লড়াই করা, নিজের জীবনের মায়া না করা ওদের স্বভাব। নিজে ছোট বা দুর্বল, পরাজয়ের বিপদ তার ভাগ্যেও ঘটতে পারে একথা সে মোটেই বিশ্বাস করে না।

যুবকের ঔদ্ধত্যের সম্মুখে যারা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে চায়, তারা বড় ঠকে। যুবক কোনোমতে দমে না। যৌবনের শক্তি অতি প্রচণ্ড। যৌবন শক্তির কাছে কত সেনাপতিকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে।

যুবকদের মনুষ্যত্বের কাছে নিবেদন কর–তার সঙ্গে প্রেমের ব্যবহার কর, তার কাছে নত হও–তার বিচারবুদ্ধির আশ্রয় নাও,–তার দয়া ভিক্ষা কর,–তা হলেই তাকে জয় করতে পারবে। সে তোমার হবে দাস এবং অনুগত বন্ধু।

মধুর ব্যবহার করাই যুবককে জয় করবার প্রধান অস্ত্র। সে সম্মান চায় না–সে চায় ভালোবাসা; সদ্ব্যবহার এবং প্রেম প্রেম ও সদ্ব্যবহার তাকে লমিতো করে।

যুবক জীবনে দুর্বলতা কোথায়? মধুর ব্যবহারের সম্মুখে, সহানুভূতিতেই সে দুর্বল। আর কোনো ক্ষেত্রে সে দুর্বল নয়। তরবারি দেখে, আগুন দেখে, কারাগারে, ফাঁসিতে–কিছুতেই তার দর্পিত প্রাণ কাবু হয় না–যদি বাঁচতে চাও, তবে তার সঙ্গে সন্ধি কর;–তবে কখনও তার সঙ্গে নীরস কঠিন ব্যবহার করো না।

যুবকেরা পাগল, বারুদের মতো সহজেই যুবকপ্রাণে আগুন ধরে। এদেরকে জননীর মতো বাবা' বলে স্নেহ করাই উচিত। কারণ এদের মধ্যে স্থিরতা, ধীরতা, গাম্ভীর্য, ধর্মভয়, বিনয়,জ্ঞান বলতে কিছু নাই।ওরা সত্যিই পাগল–যুবককে বাষ্পীয় ইঞ্জিন–আবদ্ধ শক্তি বলা যয়। বুদ্ধিমান যিনি তিনি যৌবনশক্তিকে সুপথে চালিত করেন এবং তার সাহায্যে জগতে আশ্চর্য আশ্চর্য কাজ করেন। জাতির যৌবনকে ব্যবহার করতে শেখ–তুমি জাতির পরম কল্যাণ করতে পারবে। যুবকের প্রাণ বড় সুন্দর, বড় মধুর–যে ওকে ব্যবহার করতে শিখেছ, সেই জগতের রাজা হতে পেরেছে।

যৌবনের পরম দানকে কামুকতায়, শুক্রক্ষয়ে, পাপের পথে নষ্ট করে ফেল না। স্থবির হয়ে জীবনের পরম সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হয়ো না। যৌবনের বলহারা যে হল; সে রাজ্য হারা হল। যৌবন শক্তির সদ্ব্যবহার করো।–মহাকালে, ঐশ্বরিক কার্য্যে তোমার যৌবনকে ব্যবহার করো। তোমার জীবনে বসন্ত জেগেছে, এ বসন্ত কি বৃথা হয়ে যাবে তোমার কাছে? বসন্তকে পূজা করে ঘরে তুলে নাও! —

যৌবন ছাড়া জীবনে দুঃখ হাসিমুখে আর কে অত সইতে পারে? প্রচণ্ড টাইবার নদীর বুকে অসীম সাহসে কে লাফিয়ে পড়তে পেরেছিল–সে যৌবন।

যৌবনশক্তির অপব্যবহার দেখলে আমাদের দুঃখের অন্ত থাকে না। যে যৌবন পৃথিবীতে শান্তি ও কল্যাণের মন্ত্র প্রচার করবে, তাই যদি দানবের মূর্তিতে পৃথিবীতে অশান্তি ও দুঃখ সৃষ্টি করে তবে সে কথায় অভিযোগ মানব ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

অনেক দিন আগে, দুই হাজার বছরেরও বেশি দিন আগে সমস্ত পৃথিবী জয় করবার ইচ্ছায় মেসিডেনের রাজা আলেকজাণ্ডার সুদূর ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করেছেন। তাকে এশিয়া মাইনর, আরব, পারস্য ও আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশের ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষে উপস্থিত হতে হবে। এশিয়া মাইনরে অতীতের পরাক্রমশালী ফিনিসীয় জাতির বাস। তাদের রাজধানী টায়ারের ধারে আলেকজাণ্ডার সসৈন্যের উপস্থিত হয়ে নগরের প্রতিষ্ঠিত দেবতাকে পূজা দিতে ইচ্ছা করে প্রধানদের কাছে সংবাদ পাঠালেন। উপকূল হতে পশ্চিমে অনেক দূরে সমুদ্রের ভিতর রাজধানী টায়ার অবস্থিত। সর্বদেশের, সর্বজাতীয় লোক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নগর ও ক্রয়-বিক্রয়ের কেন্দ্র স্থান বলে, এখানে বাস করে। অতীতকালে এশিয়া ও ইউরোপের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত ফিনিসীয় জাতির এই নগরের মতো সমৃদ্ধিশালী নগর আর ছিল না। পৃথিবীর অফুরন্ত সম্পদ এখানে সঞ্চিত হয়েছিল, অন্তহীন মানুষের বাস এখানে ছিল।

এই সময় কার্থেজের কাউবার সম্ভ্রান্ত অতিথি রাজধানী টায়ার নগরে এসেছিলেন। কার্থেজ টায়ার নগরের অন্যতম বিশাল সমৃদ্ধিশালী উপনিবেশ যেমন আজকাল আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ইংরেজ জাতির উপনিবেশ। তেমনি প্রাচীন পরাক্রমশালী ফিনিসীয় জাতির উপনিবেশ ছিল আফ্রিকার উত্তরকূলে অবস্থিত মহানগরী কার্থেজ। কার্থেজের অতিথিরা বল্লেন–আলেকজাণ্ডার কখনও শুভ অভিপ্রায় নিয়ে নগরে প্রবেশ করবেন না। দেবীর পূজা দেওয়া তার একটা ছল মাত্র। যদি এজন্য অস্ত্রধারণ করতে হয়, তবে কার্থেজবাসী তার জন্মদাতা টায়ার নগরকে অবহেলা করবে না। আলেকজাণ্ডার দিগ্বিজয়ী রাজ্য-লোলুপ সম্রাট। তাকে নগরে প্রবেশ করতে দেওয়ার অর্থ তার কাছে আত্মসমর্পণ করা, তার ক্ষমতার কাছে বশ্যতা স্বীকার করা। মানুষের প্রতি যৌবনশক্তির কী দারুণ অপব্যবহার হতে পারে, তাই বোঝাবার জন্যে আলেকজাণ্ডারের টায়ার ধ্বংসের কাহিনী এখানে দেওয়া হচ্ছে। সমস্ত রাজ্য জয় করেও গর্বিত যৌবনের রক্ত দমে না। এর মতো আক্ষেপ আর কী? মানুষ

চোর ও দস্যুকে ঘৃণা করে। কারণ তার শক্তি কম। সে বাধা দিতে সমর্থ হয় না। সে আপনার ক্ষমতাকে অপরাজেয় করে রাখতে সমর্থ নয়। অত্যাচারী সম্রাট আর দস্যুতে পার্থক্য নাই। আলেকজাণ্ডার টায়ারের উদ্ধত অস্বীকারে অতিশয় বিরক্ত হলেন–তিনি। রামের মতো সমুদ্র বন্ধন করে টায়ারে প্রবেশ করতেই স্থির করলেন। যে অজেয় মনুষ্য শক্তি মনুষ্য হিতে ব্যয় হতে পারত, তাই প্রযুক্ত হল মনুষ্য হনন আশায়। আজ্ঞামাত্র সহস্র সহস্র সৈন্য সাগর বন্ধনে শক্তি নিয়োগ করলো। সহস্র সহস্র বিশালাকার পাষাণ খণ্ড, বৃহৎ বৃহৎ বিশাল বৃক্ষরাজির জলমধ্যে নিক্ষিপ্ত হল, তার উপর পর্বত প্রমাণ মৃত্তিকাস্তূপ স্থাপিত হল। টায়ারবাসী তখন নিরাপত্তা আশঙ্কা করে সম্রাটের চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য। বিরুদ্ধ চেষ্টা করলেন। তারা শত শত বিশাল তরী সেতুর পাশে আনয়ন করে ডুবুরি পাঠিয়ে সেতুকে ভগ্ন ও শিথিলমূল করতে চেষ্টা করতে লাগলেন। উভয় পক্ষে সমানভাবে চল্লো। একদল মানুষের হৃদয় রক্ত পান করবার দুরাশায়, আর একদল আত্মরক্ষার বেদনায়। নগরের বহু নারী এবং প্রাচীন ব্যক্তি পূর্বেই কার্থেজে প্রেরিত হল।

টায়ারবাসী ভীষণ বাধার সম্মুখে যখন সম্রাট ভ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়লেন–তখন তিনি কাউবার নৌযুদ্ধবিশারদ জাতির সাহায্য প্রার্থনা করলেন। তারা রোষ উৎপাদনের ভয়েই আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যোগ দিলেন।

অতঃপর টায়ার প্রবেশের পূর্বেই সেতু বন্ধন ব্যাপার অবলম্বন করে উভয় দলে সুতীব্র যুদ্ধ চলতে লাগলো। বহুদূর হতে তীর নিক্ষেপ, অগ্নিবর্ষণ, গলিত তপ্ত লৌহ এবং উত্তপ্ত বালুকারাশি পরস্পরের গায়ে বর্ষিত হতে লাগল। আলেকজাণ্ডার মাত্র চতুর্বিংশ বর্ষকাল জগতে বেঁচেছিলেন, এরই মধ্যে জগতে তিনি যে নৃশংস লোমহর্ষক কাণ্ড করে গেছেন, দেশে। দেশে রক্তের অক্ষরে তা চিরদিন লেখা থাকবে। এই কী যৌবনশক্তির যোগ্য ব্যবহারঃ

অবশেষে বহু শত্রু-পরিবেষ্টিত, অভিশাপ, অত্যাচার ও দানব শক্তির প্রতীক আলেকজাণ্ডারের হাত থেকে টায়ার আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হল না। টায়ারের রাস্তাসমূহ নররক্তে ধৌত হয়ে চল্লো। একই দিনে ক্রুদ্ধ সম্রাটের আজ্ঞায় ত্রিশ সহস্র ব্যক্তির শিরচ্ছেদ হল, পনের হাজার ব্যক্তিকে দাসরূপে বন্দি করা হল। এই তো মানুষের পৌরুষ!

মানুষের প্রতি মানুষের কী ভয়াবহ রোষ আর হিংসা! মানুষ কি সত্যিই কুকুর নয়?

এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা বহুভাষাবিদ উইলিয়াম জোনক নাদির শাহের জীবনী ফরাশি ভাষায় অনুবাদ করেছেন। নাদিরের শৌর্য-বীর্য না তার অমানুষিক অত্যাচার কাহিনী তিনি জগদবাসীকে জানাতে চেয়েছেন, তা তিনিই জানেন। রক্তলোলুপ নাদির শাহ মনুষ্য হত্যায় যেরূপ আনন্দ লাভ করতেন এমন অতি অল্প লোকই করে! মনুষ্য-জীবন এদের কাছে কীটের জীবন অপেক্ষা তুচ্ছ।

মোগল–শক্তি তখন ধ্বংসের পথে। প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল সিংহাসনে দুর্বল শক্তি মুহম্মদ শাহ্ সমাসীন। নাদির দিল্লীতে প্রবেশ করে মোগল রাজ-প্রসাদে বাস করেছেন। কে বা কারা তার মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ বর্ণনা করে, তার কতিপয় সৈন্যকে হত্যা করে। ফলে নাদির দিল্লীর নিরপরাধ অধিবাসীবৃন্দকে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে শিরচ্ছেদের আদেশ দিলেন। বিচার নেই–সৈন্যগণ একদিক থেকে দিল্লীকে শ্মশানে পরিণত করলেন।

নর-শার্দুল আহমদ শাহের তরবারি ধারণ–যৌবনশক্তির নিতান্ত অপব্যবহারেরই পরিচয় দিচ্ছে। লুণ্ঠনই যেন এদের ব্যবসা নরহত্যাই যেন এদের জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ। ধর্মহীন, মায়াহীন এইসব অর্থলোভী দস্যুর দল কী জন্যে জগতে এসেছিলো, জানা যায় না। খোদাতালা হয়তো মানব জাতির শাস্তির জন্যে অভিশাপরূপেই এদেরকে জগতে পাঠিয়েছিলেন। নাদির শাহ্ সাধের দিল্লী নগরকে মহাশ্মশানে পরিণত করলেন। তৃতীয়বার পানিপথ ক্ষেত্রে মারহাট্টা এবং আহমদ শাহের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়, উক্ত যুদ্ধে দুই লক্ষ মানুষ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করেন। কী উদ্দেশ্যে, কোন কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য এইসব হতভাগ্য একই দিনে প্রাণ বিসর্জন করে? ব্যক্তিবিশেষের হত্যা ও লুণ্ঠন স্পৃহাই বিরাট হোলিখেলার কারণ। এইসব ভয়াবহ চিত্রের পার্শ্বে ফরাশি সাধু দামিয়ানের চিত্র স্থাপন করা যাক। মানবপ্রেমিক দামিয়ান, চিরকুমার হাজী মহসীন, ক্লার্কসন, উইলিবার ফোর্স প্রভৃতি মহামানবের জীবনচিত্র পূর্বকথিত ভয়াবহ জীবনচিত্রের পার্শ্বে কত মহৎ, কত উজ্জ্বল। একটি যেন ঊর্ধ্বে নক্ষত্র বিখচিত দেবতোক আর একটি যেন নিম্নে আঁধার মরণ-শঙ্কাপূর্ণ জ্বালাময় প্রেতপুরী। একটিতে আনন্দময় জীবন আর একটিতে ভয়াবহ মৃত্যুর অভিশাপ।

কুষ্ঠব্যাধির মতো মহাব্যাধি আর নাই। যে কুষ্ঠী সেই জানে এই রোগের বেদনা। কুষ্ঠীর জীবনের সকল সাধ আকাঙক্ষা চিরতরে বিলুপ্ত হয়–জীবন চরম দুঃখময় হয়। এর উপর কুষ্ঠীদেরকে মানব সমাজের ঘৃণা ও উপেক্ষা মাথা পেতে নিতে হয়। কুষ্ঠীর কাছে কোনো মানুষ যেতে চায় না–কারণ তার সংস্পর্শে এলে, তার সঙ্গে ওঠা-বসা করলে স্বাস্থ্যবান মানুষেরও কুষ্ঠ ব্যাধি হয়। কী কারণে বিধাতা মনুষ্য সমাজে এই ভয়াবহ ব্যাধি দ্বারা পীড়িত করেন, তা জানি না। তবে এ কল্পনা-সাধ্য মহাপাপের অনুরূপ একটা মহাব্যাধি। এই মহাব্যাধির অনন্ত দুঃখ যার শিরে পড়েছে তার চিরদিনের জন্য সর্বনাশ হয়েছে।

পূর্বকালে ইউরোপ মহাদেশে আইন দ্বারা কুষ্ঠীদেরকে নির্বাসন দেওয়া হতো। যার কুষ্ঠ হয়েছে তাকে মনুষ্য সমাজ থেকে ছিন্ন করে বহুদূরে সমুদ্রের মাঝে রেখে আসা হতো। সেখানে সামান্য খাদ্য দেওয়া হতো। কুষ্ঠী নর-নারীর জীবন ছিল চরম দুঃখের জীবন। অভাব, দৈন্য, মারামারি, কাটাকাটি, অবিচার, ব্যভিচার, দুঃখ–এই সব ছিল তাদের নিত্য সহচর।

কুষ্ঠীর প্রতি মনুষ্য সমাজের দয়া বড় ছিল না। কুষ্ঠীকে দেখে ভয়াবহ শার্দুল জ্ঞানে মানুষ তার কাছ থেকে পালাত। কিন্তু সত্যি কি কুষ্ঠীদের মনুষ্য সমাজের দয়া থেকে বঞ্চিত থাকা উচিত? এই হতভাগ্যদের জীবনের দুঃখ-লাঞ্ছনার প্রতি মানুষ মুখ তুলে চাইবে না? এত বড় দুঃখ লাঞ্ছনার জীবন দেখে কি মানুষ কাঁদবে না? মানুষ এতদিন বোঝে নাই–করুণা সেবা ও প্রেমই ঈশ্বরের পূজা। নিষ্ঠুর শুষ্ক উপার্জনা, গোবিন্দ' বলে চিৎকার, পাপ জয়ের সংগ্রাম বর্জিত রোজা-নামাজ–এসব ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু না। মনুষ্য সমাজের কাছে বাহবা নেবার প্রচেষ্টা মাত্র। এইসব মূর্খের দল প্রাণে অনুভব করতে পারে না–ঈশ্বর কী! পরকাল ও স্বর্গের লোভে, অপ্সরী সঙ্গ-সুখাশায় অথবা শান্তির ভয়ে এরা মুখে আল্লা আল্লা' করেন মাত্র। দুঃখী, পীড়িত আর্তের সেবা, অবোধকে জ্ঞানদান করা–এসবই হচ্ছে মানব-জীবনের বড় উপাসনা। উপাসনা আসলে ধর্ম-জীবনের একটা দিক মাত্র। উপাসনার বলে মানুষ কি স্বর্গের দাবি করতে পারে? রোজা নামাজ করলেই মানুষ এক লম্ফে বেহেস্তে যেয়ে বসবে, এও কি সম্ভব? মানুষের জন্য দরদ চাই–প্রেম চাই–আল্লার গুণ জীবনে লাভ করা চাই।

মানব-প্রেমিক দামিয়ান যৌবনের ভোগ-লালসা ত্যাগ করে মালাকো দ্বীপের কুষ্ঠীদের সেবার জন্য একদিন যাত্রা করেন। কতবড় মহান জন ইনি! সার্থক এর জীবন। তাই সর্বজাতিকে আন্তরিকভাবে বলি–আপন আপন জীবনের পাপ বর্জন করে ঈশ্বরের গুণে গুণান্বিত হও, জীবের কল্যাণ কর, আর্তের সেবা কর, বুঝে প্রার্থনা কর।––এছাড়া সমস্তই বৃথা।

দামিয়ান কুষ্ঠীদের জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজের জীবনের আশা ভরসা মিশিয়ে দিলেন, তাদের মধ্যে থেকে উচ্চ জীবনের কথা বলতে লাগলেন। তাদের জন্য ভালো খাবার, ঔষধ-পথ্য উৎকৃষ্ট পানীয় জলের ব্যবস্থা করলেন। তাদের মধ্যে বসে একসঙ্গে দয়াল আল্লাহ্ তালার কাছে প্রার্থনা করলেন। আহা! আল্লার একি দয়া! দশ বছর পরে। একদিন তার শরীরেও কুষ্ঠ রোগ দেখা দিল। সেই দিন যেন তার সেবার জীবন সার্থক হল–যে ভেদটুকু ছিল তা দূর করে নিয়ে তিনি তাদের সঙ্গে এক হয়ে গেলেন। তিনি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন–"প্রভু! আজ আমার সেবা-নিবেদন তোমার আশীর্বাদের ঐশ্বর্যে রঙিন হয়ে উঠেছে। আজ আমার প্রেম সকল পরিপূর্ণতায় সফল ও সার্থক হল। তোমার এ করুণ প্রেমের নিমন্ত্রণ যেন শেষ পর্যন্ত বহন করতে পারি।" ধন্য বীর! ধন্য তোমার যৌবন! সার্থক হে মহামানুষ তোমার জীবন! কুষ্ঠীদের সেবা করতে করতে একদিন তিনি মহাপ্রস্থান করলেন।

মানুষকে শৃগাল, কুকুর, গরু, ঘোড়ার মতো এককালে ব্যবহার করা হতো। মানুষের কাছে মানুষের কোনো সম্মান ছিল না। জীবিত মানুষের গায়ে এনাটমী শেখবার জন্য অস্ত্র চালনা করা হতো। যোগিনী মাতা রাবেয়া বসরীর শরীরে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের কৌতূহল নিবারণের জন্যে তীক্ষ্ণ অস্ত্র চালনা করা হয়েছিল–সে দুঃখের নির্যাতন কাহিনী হয়তো অনেকে জানেন। দেবী রাবেয়া ছিলেন এক ধনী গৃহস্থের কৃতদাসী। নিমন্ত্রিতরা বলে এই দাসীর গায়ের অস্থিবিন্যাস কেমন আমাদিগকে দেখাতে হবে। গৃহস্বামীর আদেশে রাবেয়াকে পশুর মতো ধরে তার শরীরে অস্ত্র চালনা করা হলো। চরম দুঃখ সয়ে রাবেয়া প্রভুর আদেশ পালন করলেন। এই রাবেয়া মহাতপস্বিনীরূপে, সফলময়ী মাতা রাবেয়ারূপে। অনন্ত মানুষের শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন। দিকে দিকে সকল দেশে ক্রীতদাস-দাসীর বেদনা উচ্ছ্বাস আকাশ-বাতাস বিষাদ অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে তুলেছিল। দাস-দম্পতির বুকের ধন কেড়ে নিয়ে প্রভু অর্থ লালসায় উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করতেন। যারা স্বামী-স্ত্রী রূপে এক সঙ্গে বহু বছর বাস করেছে, প্রভুর ইচ্ছায় একদিন তাদের একজনকে বহু দূর দেশীয় এক ব্যবসায়ীর কাছে উচ্চ মূল্যে বিক্রি করা হল। এ জীবনে তাদের পরস্পর আর দেখা হবে না। বেত্রাঘাতে দাস-দাসীর শরীর ক্ষত-বিক্ষত করা হতো–কুকুর লেলিয়ে দিয়ে তাদেরকে ধরা হতো। প্রভু ইচ্ছা করলে তাদেরকে হত্যা করতে পারতেন। মানুষের উপর মানুষের এই অত্যাচার-মহাপ্রাণ ক্লার্কসন নামক এক যুবক চিত্তে কঠিন আঘাত করেছিল! তিনি জ্বলন্ত ভাষায় ক্রীত দাস-দাসীর কঠিন দুঃখের বর্ণনা সভ্য মানুষের কাছে সর্বত্র নিবেদন করলেন। সেই মর্মস্পর্শী বেদনা কাহিনী পড়ে মানুষ বিচলিত হল। সর্বত্র ঘরে ঘরে এই মহাপাপ প্রথার বিরুদ্ধে কঠিন মন্তব্য প্রচারিত হতে লাগলো। মানুষের যৌবন গরিমা বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি ক্লার্কসনের আন্দোলনে বিচলিত হল। দেশের সমবেত বিদ্রোহবাণী দাসপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করলো। বৃটিশ সাম্রাজ্যে দাস ব্যবসা বেআইনী বলে ঘোষিত হল। কালে সমস্ত সভ্য জগত বৃটিশ জাতির পদাঙ্ক অনুসরণ করল, জগতের সবাই মানুষ। সবাই মানুষের ব্যথা মুখ তুলে চেয়ে দেখে–কই একজনও তো একটা কথা কয় না! বিলাতের জনৈক ডাক্তার সমাজ পরিত্যক্ত মানবশিশু, গৃহহারা নারী, অন্ধ খঞ্জ কুষ্ঠীদের জন্যে প্রায় শতাধিক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে যে আর্দশ স্থাপন করে গেছেন, তার তুলনা কোথায়? সর্ব, দেশের যৌবন কি পৃথিবীর পাপ বেদনা দুঃখের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হবে?–জাতি জাতিতে রেষারেষি কেন? পুণ্যে এবং পাপে, আলোকে এবং আধারে, সত্যে এবং মিথ্যায় যে মহাসংগ্রাম জগৎ জুড়ে চলেছে সেই মহাসগ্রামে হে মনুষ্য যৌবন, তোমার

সমস্ত গরিমায় তুমি জেগে ওঠ। জগতে পুণ্যের আলোক এবং সত্যের জয় হোক। অন্যায়, অত্যাচার, মিথ্যা, পাপ, দুঃখ লজ্জিত হোক।

মানব-প্রেমিক হাজী মহসীন, চিরকুমার হাজী মোহসীন তার জীবন যৌবনকে সার্থক করেছেন বাঙলার মুসলমান যুবকদের আত্মোন্নতির কল্যাণ অনুষ্ঠানে। এতকাল চলে গেল, আর দ্বিতীয় কোনো হাজী মোহসীনের আবির্ভাব বাঙলায় হল না। করটিয়ার জমিদার চাঁদ মিয়া তার বিস্তীর্ণ জমিদারি নিয়ে শুধু এই যৌবন পূজার মঙ্গল উৎসবে দ্বিতীয় মোহসীনরূপে যোগদান করেছেন। বাঙলার মুসলমান সমাজে মনুষ্যত্ব মরে গেছে। যৌবন চিরসমাধি লাভ করেছে। সুখ-অন্বেষী যুবক স্থবিরেরা স্বার্থের দেউল প্রতিষ্ঠিত করে মৃত্যু ও অধঃপতনের পূজা আরম্ভ করেছে। হায় যৌবন! বাঙলার ঘরে ঘরে বৃথাই তোমার জীবন! নিরর্থক তোমার অস্তিত্ব। সকল জাতিই যৌবন গরিমায় জেগে উঠেছে, তুমি শুধু রইলে ঘুমিয়ে। জীবনহীন, প্রাণহীন, আবৃত্তি হল তোমার এবাদত! লক্ষ লক্ষ মুসলিম নর-নারী শয্যায় শায়িত-জীবনের কোনো চিহ্ন নাই, যৌবন তো দূরের কথা।

.

**০২. নরহত্যা**

প্রাচীন বর্বর যুগের অবসান হল না। বৃথাই সভ্যতার দাবি। সে পশু ছাড়া আর কী? তার আবার ধর্ম!

মানব-যৌবনের স্বভাব সদাই বিদ্রোহী হওয়া ন্যায় ও বিচারের মাথায় পদাঘাত করে যৌবন তার উচ্ছলতা নিয়ে দুর্দম ব্যক্তিত্বে খেয়ালী জীবন যাপন করতে চায়। তার কাছে বিচার, শৃঙ্খলা, মনুষ্যত্ব ও বিবেকের কোনো মর্যাদা থাকে না। সে বেতাল তাণ্ডব নৃত্যে পৃথিবীতে, মনুষ্য সমাজে আপনার উদ্দাম বেগে চরণ ফেলে চলতে চায়। তাই তার শাসন প্রয়োজন। তরবারি ও অগ্নিবাণের ভীতিতে তার সকল উচ্ছলতাকে শাসন করে রাখতে চায়। যৌবনের স্বভাবই বিদ্রোহ–সে চির অশান্ত, উন্মাদ, পাগল।

যদি জগতে রাজা না থাকতেন, শাসন না থাকত, তা হলে মনুষ্য সমাজ আপন যৌবন তেজে বিদীর্ণ হয়ে যেত। রাজার শক্তি দেশ ও জাতিকে, মনুষ্য সমাজকে প্রতাপপূর্ণ শাসন ক্ষমতায় বাঁচিয়ে রেখেছে। জগতে পিতার মতো রাজারও আবশ্যকতা আছে। যেখানে পিতা দুর্বল, সেখানে ছেলেরা এবং মেয়েরা সবাই বিদ্রোহী–যেখানে রাজা শক্তিহীন দুর্বল, সেখানে প্রজার মধ্যে অরাজকতা বিরাজ করে–জাতি বিশৃঙ্খল গতিতে ধ্বংসের পথে যায়।

মানব সমাজের জন্য শাসনের আবশ্যকতা আছে স্বীকার করি, কিন্তু কথায় কথায়। রাজ্য-লোভে বক্ষের রক্ত-পিপাসায় প্রচণ্ড উন্মাদন হাতিয়ার নিয়ে বের হওয়া–বড়ই বেদনার কথা।

Battle; Battle; Battle; এছাড়া যেন আর বীরত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্র নাই। যে জাতি যত যুদ্ধে জয়ী হয়েছে, তার তত সুনাম। কী করে মানুষ তার নিজের দ্বিতীয় মূর্তির বুকে বর্শা বিদ্ধ করে? বড় বেদনার কথা। জাতির বিরুদ্ধে জাতি তীর ধনুক, কামান নিয়ে, আগুন নিয়ে কেমন করে ছোটে! মানুষের ঘরে কি মা, বোন, সন্তান, পিতা নাই–কেমন করে মানুষ একটা শান্তিনিষ্ঠ জাতিকে খুন করতে অগ্রসর হয়। মানুষ কয়দিন বাঁচে? কয়েক দিনের জীবনের জন্য, কীসের জন্য মনুষ্য হত্যা?

এই ছাই মাটির পৃথিবীর জন্য? বাংলার শেষ নবাব মীর কাসিম, বান্দ রাজবল্লভ, মহাতাপ চাঁদ, জগৎশেঠ, কৃষ্ণ দাসকে নিজের নিরাপত্তার জন্যে নিশিথ রাত্রে গঙ্গা নদীতে জীবন্ত অবস্থায় গলায় মাটির থলি বেঁধে ডুবিয়ে মারেন। মহাপ্রাণ বৃদ্ধভমতো চুনী সহানুভূতিতে প্রভুদের সঙ্গে স্বেচ্ছায় গঙ্গার পানিতে নিজ প্রাণ দিল। মানুষের প্রতি এই নির্মমতা, মানুষের প্রতি এই নিষ্ঠুরতা কী প্রকারে মনুষ্য সহ্য করে? এ পাপের শাস্তি মানুষকে ভোগ করতেই হবে। এই ছার রাজত্বের জন্যে মানুষ এতবড় নৃশংস আচরণ করতে পারে?

হে বন্ধু, তোমার পায়ে ধরি! মনুষ্য বুকে বর্শা চালিও না। এ মহা-পাপ করো না। কীসের জন্যে মানব প্রাণের অভিশাপ, তাঁর আঁখিজলের বিষবাণ বুক পেতে নিচ্ছ? দেখ দেখি কেমন করে তোমার বর্শাঘাতে আহতের চোখ দু'টি চিরদিনের জন্যে মুদিত হয়ে যায়, আর কথা বলে না–অভিযোগ করে না।

দস্যু, নর হন্তাকে মানুষ ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলায়–এ সমর্থন করা যায়। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ রোষবশত নিজের পার্থিব সামান্য সুবিধার জন্যে; রাজ্য লোভে মানুষ খুন করে কেন, জাতি বিশেষকে সমূলে চূর্ণ করে ফেলে কেন? এতো জরদস্তি। জোর যার, মাটি তার–এ বর্বর নীতির অনুসরণ।

কথায় কথায় মনুষ্য হত্যার যুগ, রাজনৈতিক অপরাধে মানুষকে ফাঁসি দেবার যুগ, সভ্য জাতিদের ভিতর থেকে বর্তমানে হয়ত চলে গেছে। কিন্তু মানব জাতির যুদ্ধসজ্জা, জাতিতে জাতিতে মারামারি, রক্তারক্তি, কাটাকাটি–এ তোমার কী?

এই সেদিনের কথা–বিশ্ব জয়ের দুর্বার বাসনায় সুসভ্য জার্মান জাতি যৌবন গর্বে ন্যায়-ধর্মকে পদদলিত করে নিরপরাধ বেলজিয়ামকে চূর্ণ করে দিল। ফরাশি সীমান্তে যে ভীষণ অগ্নি তারা প্রজ্বলিত করেছিল–জগতের ইতিহাসে তার তুলনা নাই। ধন্য ফরাশি জাতি! শক্তির অসাধারণ পুত্র ফরাশি, ইংরাজ ও মার্কিনের সাহায্যে নিজের ও পৃথিবীর অবস্থা রক্ষা করেছে। যদি ফরাশি রাজ্য জার্মান হস্তে বিধ্বস্ত হতো, তা হলে না জানি আজ পৃথিবীর অবস্থা কী হতো। হায়, মানুষ ক্ষমতার গর্বে এত অন্ধ হয়! মানুষের শান্তি সুখ সে সহ্য করতে পারে না–এমনই তার হিংসাভরা প্রাণ। সে দেবতা না পিশাচ তা কে জানে? পৃথিবীতে কি পুনঃপুনঃ রক্তারক্তি হতে থাকবে? কি জানি কি কারণে গাজী আবদুল করিমের শান্তিপুর্ণ রাজ্যে ইতালী অশান্তির আগুন জ্বেলে দিল। একটা নিরীহ জাতিকে ইতালী অযথা চূর্ণ করে দিল। হায় রাজ্যলোভ! হায়, মানুষের অবিচার। জোর যার রাজ্য তার। জগতে বিচার কোথায়? ধর্মই বা কোথায়!–মনুষ্য হত্যার বিচার নাই। মনুষ্য হৃদয়ে দয়া কই? মনে হয় পরাভব স্বীকার করাও ভালো, তত্রাচ সমর-প্রবৃত্তি ভালো নয়। রাজ্য ত্যাগ করে বনে গমনও ভালো, তত্রাচ মানুষের বুকের রক্ত দেখতে ভালো লাগে না। জগতের সকল মানুষই কি নিষ্ঠুর ধর্মহীন বর্বর? মানুষ মাত্রেই মানুষের দয়ার পাত্র, মানুষ মাত্রেই মানুষের নমস্য। মনুষ্য হত্যা না করলে কি মানুষের কল্যাণ করা যায় না? সভ্যতার প্রচার হয় না? আঘাত না করলে কি মানুষের সুবুদ্ধি জাগে না? মানুষ কি এতই অন্ধ? সে নাকি ঈশ্বরজাত? মানুষ জাতি নাকি ঈশ্বরের অংশ? আপন আত্মা হতে নাকি ঈশ্বর আদি পিতা আদমকে সৃষ্টি করেছেন? তার পরিচয় কি এই? তার কাজ দেখে তো মনে হয় সে শয়তানের অংশ।

মানুষকে ফাঁসিকাষ্ঠে দিয়ে, তার শিরচ্ছেদ করে জনসাধারণের মনে ভীষণ ভীতি সৃষ্টি করা রাজধর্ম হতে পারে–আমরা রাজা নই, রাজত্ব করি নি, রাজধর্ম বুঝতে পারি না। আমাদের কাছে পিতার বিরুদ্ধে পিতাকে বন্দি করা, সিংহাসনের জন্যে ভ্রাতৃহত্যা–এসব ভালো লাগে না। অথচ মোগল সম্রাটগণ এই সমস্ত জঘন্য কলঙ্কে কলঙ্কিত। জীবনে একটি মানুষ হত্যা

করলে জীবনের সমস্ত পুণ্যে তার প্রায়শ্চিত্ত হয় না। আর যারা অর্থ সম্পদ লুণ্ঠনের জন্যে সহস্র সহস্র নর রক্তে ধরণী রঞ্জিত করেছে, তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কী করে হবে? কেমন করে তারা এত মানুষের শোণিত পাতে আপন মস্তিষ্ক ঠিক রাখে? রাজধর্ম যদি স্বতন্ত্র হয়, তবে ঈশ্বরের গ্রন্থসমূহে তার উল্লেখ দেখি না কেন?

.

### ০৩. পাপ প্রবৃত্তি

যুবক বয়সে যুবকদের শিরায় এক মহাপাপ প্রবৃত্তি জাগে। ব্যভিচার লিপ্সা ছাড়া আর এক রকম পৈশাচিক ক্ষুধা যুবকচিত্তে জাগে যা মনুষ্য ভাষায় বলা অসম্ভব। যে মহাপাপে সডম ও গমোরা (Sodom and Gomora) নামক দুই প্রাচীন নগরী ধ্বংস হয়েছিল, তিক্ত লবণ সমুদ্রে পরিণত হয়েছিল–সেই পাপ ক্ষুধা মনুষ্য সমাজ হতে এখনও অন্তর্নিহিত হয় নাই–এ আমাদের সত্যিকারের অভিজ্ঞতা। এখানে একটি সত্য ঘটনা দিচ্ছি।

একটি যুবক–একদা এক ভদ্রলোকের বাড়িতে আসা-যাওয়া আরম্ভ করলেন। সেই ভদ্রলোকের একটি সুদর্শন পুত্র ছিল। পুত্রটি নিজমুখে তার জীবনের অভিজ্ঞতা আমাকে হাসপাতালে শয্যায় শুয়ে বলেছেন–যাতে–তার গোপনীয় জীবনকাহিনী শুনে দেশের অন্যান্য ছেলেরা এবং তাদের অভিভাবকগণ সাবধান হতে পারেন। তিনি বল্লেন–তখন আমার বয়স চৌদ্দ বছর। কেবল যৌবন দ্বারে উপনীত হয়েছি। এমন সময় আমাদের গ্রামের আজিজ মিয়া আমাদের বাড়ি আসা-যাওয়া আরম্ভ করলেন। আজিজ মিয়া এখন খুব উন্নতি করেছেন, আমি বিবিধ পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর পথে দাঁড়িয়েছি। ইনি মনুষ্য মূর্তি ধারণ করলেও ইহাকে নরপিশাচ বলা চলে। এর জীবনের পাপময় ঘটনা জগতের কাছে প্রকাশিত হলে জগতের মানুষ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হবে নিশ্চয়। আমি এক এক করে সব কথা বলছি। –আজিজ মিয়ার পিতা সম্ভ্রান্ত মানুষ। কয়েক বছর আগে মারা গিয়েছেন। আজিজ মিয়াই এখন সংসারের কর্তা। প্রথমা স্ত্রীর উপর আসক্তি না জন্মায় দ্বিতীয় বার বিবাহ করেছেন। প্রথমা স্ত্রী মাতার বোনের মেয়ে। দ্বিতীয় স্ত্রী নিকটবর্তী কোনো এক গ্রামের কোনো এক সাধারণ গৃহস্থের বিধবা কন্যা। এই যুবকের পিতা উচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন। রাজ কর্মচারীকে খুব সম্মানের চোখে দেখা গৃহস্থ শ্রেণীর লোকের স্বভাব। সুতরাং আজিজ মিয়ার আগমনে আমার পিতা-মাতা খুব খুশি হতেন। আজিজ নিজে শিক্ষিত ভদ্রলোক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট। বয়স ত্রিশ।

আজিজ মিয়া অনেক সময় আমার সঙ্গে কাটাতেন। পার্শ্বে বসে পড়া বুঝিয়ে দিতেন। সাধারণের দৃষ্টির আড়ালে হঠাৎ তার বাম হাত খানি আমার বস্ত্রাবমতো লজ্জাস্থানের উপর প্রায়ই রাখতেন। আমি তাতে তাকে অতিশয় সরল এবং নিষ্পাপচিত্ত মনে করতাম। হঠাৎ তিনি একদিন আমায় একখানা চিঠি দিলেন। পত্রখানি এইরূপ–

“যেদিন বিদেশ হইতে বাড়ি আসিয়া তোমাকে দেখলাম, সেইদিন তুমি আমার হৃদয়ে রাজার আসন লইলে। শয়নে স্বপনে দিন রাত্রি নয়নে তোমারই মধুর মূর্তি দেখি, এ জগতে কাহাকেও তোমার মতো সুন্দর দেখি না। মজনু যেমন লাইলীকে ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছিল, আমিও তেমনি তোমাকে ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছি। তোমার মধুর নাম সর্বদা আমার জপমন্ত্র হইয়াছিল। এ ভালোবাসা রোজ কেয়ামতো পর্যন্ত থাকিবে। এ ভালোবাসা স্বর্ণময়, পবিত্র! এ পবিত্র প্রেমের পুণ্যে আমরা যে উভয়ে বেহেস্তে যাইব, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। ইচ্ছা হয় সর্বদা তোমায় বুকে করিয়া রাখি। দিন রাত্রি ২৪ঘন্টার মধ্যে

প্রায় ১৮ঘন্টাই তোমার কাছে বসিয়া থাকি। ইহার কারণ কি এখনও বুঝিতে পার নাই? একবার বল, প্রাণ ভরিয়া বল, তুমি আমায় ভালোবাস, নইলে আমি বাঁচিব না তোমার মোহন মধুর ছবি যেদিন হইতে দেখিয়াছি সেদিন হইতে ...।"

আমি এসব রঙের কথা কিচ্ছু বুঝি না, তবে মনে মনে এতবড় একজন লোকের এইসব ভালোবাসার কথা মনে করে খুব গর্ব এবং গৌরব অনুভব করলাম। তার ভিতর যে গরল ছিল, তা মোটেই টের পাই নি।

আমার পিতা-মাতা তাঁর নিত্য আগমনে খুব গৌরব বোধ করতেন। ভদ্রলোকের ছেলে, নিজেও শিক্ষিত। সুতরাং তার আগমনে আমাদের মতো লোক গৌরব বোধ করবেই তো। আমি যেন একটা মস্ত বড় লোক হয়ে পড়লাম। ইত্যবসরে কোনো কাজে আমার পিতার খরচে তার সঙ্গে আমার"দার্জিলিং ভ্রমণের দরকার হল।

সেই শহরে যেয়ে একদিন রাত্রে আমার মুখে তিনি অজস্র চুম্বন করলেন। এবং আমি যেন তাঁর পত্নী সেই ভাবে ব্যবহার করলেন। আমি তাকে মৌলবী সাহেব বলে ডাকতাম। –মৌলবী সাহেবের ব্যবহারে আমি যেন মনে কত দুঃখ পেলাম, তা বলবার নয়। আশ্চর্যের বিষয় তিনি তাঁর দুষ্কৃতির জন্য কিছু মাত্র লমিতো হলেন না। যেন কিছুই হয় নি, এইভাবে কথা বলতে লাগলেন। আমি আশা করেছিলাম, তিনি আমার মুখের দিকে চেয়ে কথা বলতে পারবেন না। পবিত্র বন্ধুত্বের নামে একটি ভদ্রলোকের নিষ্পাপ বালকের বুকে তিনি এইভাবে পাপের কীট হয়ে প্রবেশ করলেন। তিনি এরপর ২/১ দিন পর পর আমার সহিত সেইরূপ পাপ ব্যবহার করতে লাগলেন। আমি লজ্জায় মানব সমাজের কাছে এই নির্দয় পাপের কথা প্রকাশ করতে পারলাম না। বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, তাকে কোনোদিন অনুতপ্ত হতে দেখলাম না। তিনি একটি চাকরি পেলেন এবং আমার গুরুজনকে বলে আমাকে বাসায় নিয়ে গেলেন। আমি বহু প্রকারে তার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে চেষ্টা করলাম। তাকে বেত দিয়ে প্রহার করলাম। তাতে তিনি অধিক আগ্রহে আমার উপর পত্নীর। ন্যায় ব্যবহার শুরু করলেন। আপন যুবতী স্ত্রীকে ফেলে তিনি আমার সঙ্গে রাত্রি যাপন করতেন। আমাকে অবিশ্রান্ত চুম্বন করতেন এবং আমার জিহ্বা টেনে বার করে চুষে চুষে খেতেন। এতে যে আমার কী কষ্ট হতো তা বলবার নয়। তিনি এইভাবে ৪/৫ বছর ধরে আমার উপর অত্যাচার করলেন। আমার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেল। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় তিনি দূরদেশে চলে গেলেন এবং পূর্ব পত্নীদের মৃত্যুর পর এক বিত্তশালী ধনী কন্যাকে। বিবাহ করলেন। ইত্যবসরে সংসারের বহু দুঃখে নির্যাতিত হয়ে সান্ত্বনার জন্যে আমিও বিবাহ করলাম। এইভাবে তার হাত থেকে রক্ষা পেলাম। শরীর ধ্বংস হয়ে যাওয়াতে লেখাপড়া ত্যাগ করতে হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয়, তাকে কোনোদিন অনুতাপ করতে দেখলাম না। দূরদেশ থেকে কত পত্র আমাকে লিখতেন। চিঠির উত্তর না পাওয়াতে কত বিশিষ্ট ভদ্রলোকের কাছে আমার নামে স্নেহের অনুযোগ করে পাঠাতেন। বাহিরের লোক ভাবতে তিনি আমাকে সরল প্রাণে শুধু ভালোবাসেন, কিন্তু আমি জানতাম তিনি আমাকে কী প্রকার ভালোবাসেন। সেসব অনুযযাগের কোনো উত্তর আমি দিতাম না!"

বাংলাদেশে এইভাবে শত স্থানে যুবকেরা নিজেদের উপর অত্যাচার করে। এর কোনো প্রতিকার হয় না।

আমাদের সমাজ জীবনে কত দিক দিয়ে কত গলদ আছে তার ঠিকানা নেই। জ্ঞান শিক্ষার ও চরিত্র উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সব ত্রুটির অবসান হবে, এমন আশা করা যায়। তবে মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে দ্রুত উন্নতির আশা করা যায় না। মুসলমান সমাজ শিক্ষার জন্যে শিক্ষা করতে চান না। ধর্মের জন্যে, মনুষ্যত্বের জন্যে যদি মুসলমান সমাজ লেখাপড়ার চর্চা করতেন তা হলে

এতদিনে নারীশিক্ষা প্রচার হতো। এই অসভ্য সমাজ যেখানে আর্থিক লাভের আশা নেই, সেখানে বিদ্যাচর্চা করতে চায় না। ভালো চাকরি লাভ এদের বিদ্যা চর্চার প্রধান আকর্ষণ। যেখানে সে আশা নেই, সেখানে এদের চেষ্টাও দুর্বল। চাকরির আশা ক্রমশ দেশে কমে আসছে। এ অবস্থায় শিক্ষা লাভের উৎসাহও সমাজ থেকে কমে যাচ্ছে। নামাজ-রোজা করেই এরা পরকালের পাথেয় অর্জন করেন, জীবনের গ্লানি ও 3টি সম্বন্ধে এদের সুতীক্ষ অনুভূতিই নেই। তবে সমাজের উচ্চস্তরের লোক যারা, তাদের উন্নতির প্রতি, জীবনের প্রতি সুতীব্র শ্রদ্ধাবোধ আছে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

এই পার্থিব জীবনে, নিজের এবং অপরের যেখানে যে দুঃখ, যে গ্লানি ও ত্রুটি আছে–সে সব দূর করা সভ্য এবং ঈশ্বর মনোনীত সমাজের কাজ। তাই আশা ও উৎসাহে মানব সমাজের ত্রুটি এবং কল্যাণের চিত্র অঙ্কিত করতে সাহিত্যিকেরা সদা সচেষ্ট। তাদের বিদ্যালাভ সার্থক হয়, যারা এসব সাহিত্যিকের চিন্তা ও কল্যাণকে জীবনে গ্রহণ করেন।

.

বাড়িতে হোক, বিদেশে হোক, ছেলেমেয়েদের এক প্রকোষ্ঠে একাধিক ব্যক্তির রাত্রি যাপন উচিত নহে। যে যার প্রকোষ্ঠে দরজা দিয়ে শুয়ে থাকবে। রাত্রির অন্ধকারে অসভ্য সমাজে বহু পাপ অনুষ্ঠিত হয়। যদি সে সুযোগ না থাকে, তবে পাপের অনুষ্ঠানও কমে।

রাত্রিকালে যুবকেরা পার্শ্ববতী সুপ্ত বালক-বালিকাদিগকে আক্রমণ করে। তাদের তখন হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। সরলচিত্ত মাতাপিতা এবং বয়োজ্যেষ্ঠরা যুবকদের পাপ সন্দেহ করেন না। যৌবনকালে অপরিমিত এবং অন্যায় শক্তি ব্যয়ে মানব-জীবনের আয়ুমূলে যে ভীষণ কুঠারাঘাত হয়, তার সংশোধন জীবনে হয় না।–মানব সমাজের এ অতি সাংঘাতিক পাপ। আশা করি, অভিভাবকেরা এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সর্তকতা অবলম্বন করবেন এবং আপন আপন নিষ্পাপ পুত্র কন্যাদেরকে অকাল মৃত্যু এবং জীবনের ভবিষ্যৎ মরণ যন্ত্রণা হতে রক্ষা করতে চেষ্টা করবেন। এ পাপের শেষ ফল আছেই–সেই দুঃসহ দুঃখের হাত হতে কোনোমতে এড়ান নাই।

.

**০৪. কঠিন যুদ্ধপ্রিয় জীবন**

মনে হয়, যৌবনের একটা আকর্ষণ আছে–জীবনের রুদ্র ভয়াল শোণিত উৎসবের প্রতি! মৃত্যুর সঙ্গে, জীবনের অতি ভীষণ কঠিন অবস্থার সঙ্গে সে খেলা করতে চায়। পৃথিবীর এই সুখ-শান্তি যেন তার ভালো লাগে না। যায় যাবে প্রাণ–এই মানবিক ভাব নিয়ে সে জীবনের ভয়াবহ বিপদসঙ্কুল খেলায় যোগ দিতে চায়। এই প্রচণ্ড রক্ত-উৎসবের মাঝেও সে গৌরবের মুকুট শিরে ধারণ করতে আকাঙক্ষা করে। জীবনের অনন্ত সমস্যা মাঝে যুবকের প্রাণ অনেক সময় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে–পৃথিবীর কিছুই ভালো লাগে না। সে মৃত্যুর জন্যে যেন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। হয় পৃথিবীর অফুরন্ত ঐশ্বর্যের প্রতিপালক হয়ে অপার সুখে সে বাস করবে, নয় এই দুঃখ-দীর্ণ জীবনের বন্ধন হতে সে চিরবিদায় নেবে–এই হয়ে দাঁড়ায় তার। মনোভাব। গৃহের সুখ আর সহ্য হয় না–যেন কন্টকের মতো বিধে। সে চলে যেতে চায় রণাঙ্গনে, মরণকে বরণ করতে, অথবা মরণকে জয় করতে।

জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ হয়। ন্যায় অন্যায় নিয়ে। অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার জন্যে, যৌবন ক্ষিপ্ত সিংহের বিক্রমে রণক্ষেত্রে ছুটে যায়। প্রচণ্ড উল্লাস তার হৃৎপিণ্ডের রক্তে তরঙ্গিত হতে থাকে। এই রক্তের উল্লাস, যৌবনের এই ক্ষুধা মানুষের জীবনে এক পরম স্বর্গীয় দান। মানুষ কি চিরদিনই বেঁচে থাকে? কত যৌবন অকালে জীবনের সাধ আকাঙক্ষা পূরণ না হতেই ব্যাধি, পীড়ায়, দুর্ঘটনায় কোথায় চলে যায়? এর চেয়ে মানব হিতে, সত্য প্রতিষ্ঠায়, ন্যায় যুদ্ধে গৌরবের মৃত্যু বরণ করাই তো ভালো। যারা মৃত্যুকে ভয় করে তারাই হয়তো বেশি মরে। ঈশ্বরের অনন্ত রহস্য অনুভূতির অতীত। তিনি কোনো অজ্ঞাত নীতি সূত্রে সৃষ্টি শাসন করছেন তা মানুষ কি বুঝতে পারে? যা একটু বোঝে, তাতেই তার বুদ্ধি অবাক এবং বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়।শ্রদ্ধার করজোড়ে সে প্রভুকে প্রণাম করে। মনুষ্য মরণের পর কোথায় যায়, তাই বা কে জানে? কে বিশ্বাস করে মানুষের জন্য এক কল্যাণের ভবিষ্যৎ আছে, যেখানে মানুষের সকল দুঃখের চির মীমাংসা হবে। যৌবন সময়ে ভবিষ্যৎ জীবনের পুরস্কার লোভে গৌরবের মরণ বরণ করে। মরণের সঙ্গে খেলা করতে করতে জাগে, হাসিমুখে অনন্তের শয্যায় লুটিয়ে পড়ে।

এ পিপাসা পশুর রক্ত পিপাসা নয়। এ স্বর্ণময় পিপাসা তার মনের কাছে অন্তরের আহ্বান। দূরে কোনো স্বপ্নরাজ্যের মোহন ধ্বনির মতো প্রিয়া অভিসারের নিমন্ত্রণ। স্বর্গচ্যুত বিরহী আত্মার বেদনা-ব্যাকুল, অশু ভরা আহ্বান অথবা সন্তান-হারা জননীর 'আয় আয়' ধ্বনির মতো আত্মার কাছে এক শাশ্বত আর্তনাদ।–সে ছুটে যায় এই অসীমের নিমন্ত্রণে–পিপাসা-কাতর আত্মার তৃপ্তির জন্যে। যে দুর্বলা নারী, নিঃসহায় শিশু, পদানত শত্রু, শক্তিহীন বৃদ্ধা, শিল্পী কৃষক, নিরীহ গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে অস্ত্র নিক্ষেপ করে সে কখনও যোদ্ধা নয়। শাস্তির পাত্রকে শাস্তি দাও। সৈনিকের প্রাণে অসীম দরদ।–সে মনুষ্য হত্যা করে ন্যায়ের আহ্বানে, ব্যক্তিগত স্বার্থের বা হিংসা-ক্রোধের বশবর্তী হয়ে নয়। নিরাপরাধের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করা তার পক্ষে মহাপাপ। সে নরভুক শার্দুল নয়, সে শান্তি প্রতিষ্ঠাতা দেবতার সন্তান।-দুঃখের ও অবিচারের শত্রু। সে দুঃখী এবং নিঃসহায়ের রক্ষাকর্তা। তার কাছে কোনো অবিচার নাই।

কৌশলের রাজা দুঃখীর বন্ধু হয়ে, দুঃখীকে দরদ করে দেশের সকল মানুষের পরম আত্মীয় হয়েছেন। তার নাম শুনে রাখাল বালক, ঘরের বধূ এবং পথের ভিক্ষুকও হাত তুলে ভক্তি জানায়। দাম্ভিক কাশীরাজ কোশল-রাজের এই প্রতাপ ও আধিপত্য দেখে জ্বলে পুড়ে মরছেন। কোশল-রাজকে অপদস্থ, লাঞ্ছিত এবং নিগৃহীত করা চাই-ই। কোশল রাজের রাজ্য বড় নয়–তার সৈন্য সংখ্যাও বেশি নয়, কাশীর অধীনস্থ একটি সামান্য রাজ্য–অথচ তার নামই বেশি। কাশী-রাজ মন্ত্রীকে আদেশ করলেন, 'মন্ত্রীবর, আপনি সৈন্য প্রস্তুত করুন। কোশল-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাব। তাকে যুদ্ধে পরাজিত করে, রাজ্য। থেকে তাড়িয়ে দেব। দেখি তার নাম থাকে কোথায়?' মন্ত্রী মনে মনে হাস্য করলেন। ভাবলেন, যে দয়াগুণে এবং মনুষ্যত্বে মনুষ্যের হৃদয় অধিকার করেছে তাকে জব্দ করা কঠিন। বাহিরে রাজাদেশ পালনের আয়োজন করলেন।

যথাসময় কোশল-রাজ সংবাদ পেলেন–কাশী রাজ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান করেছেন। হায়, তার জন্যে কত মানুষের জীবন হানি হবে কত পবিত্র রক্ত মাটি সিক্ত করবে। তার চাইতে রাজ্য ছেড়ে পরাজয় স্বীকার করে, রাজ্য ছেড়ে বনে পালিয়ে গেলেন। কাশী-রাজ আনন্দে প্রচার করলেন–যে এতবড় কাপুরুষ, যে প্রাণ ভয়ে এত ভীত, সে কি সিংহের সম্মুখে বুক টান করে দাঁড়াতে পারে? তার সভাসদেরা সে কথা শুনে কোনো উত্তর দিল না মাথা নত করে রইল।

পুরবাসী গোপনে গোপনে কোশল-রাজের জন্যে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলছে। পরাজিত হয়েও তিনি মানুষের ভালোবাসা হতে বঞ্চিত হলেন না। পুরবাসীর প্রাণ সহানুভূতি ও বেদনায় কোশল-রাজের সঙ্গে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে! কী বিপদ রে! সে-সব প্রশংসা বিষের মতো কাশী-রাজের কানে লাগে। তিনি যুদ্ধে জিতেও কোশল-রাজকে জব্দ করতে পারছেন না।

ক্রোধে প্রচার করে দিলেন, যে কোশল-রাজের মাথা কেটে এনে দেবে, তাকে লক্ষ মুদ্রা দেব। সে কথা শুনে কাশীর রানীরা পর্যন্ত জিভ কেটে বল্লেন—কী সর্বনাশ, কী অধর্মের কথা!

.

এক কাভালো বন-পথে কোশল-রাজকে দেখে বল্লে-ফকির, দুঃখীর বন্ধু কোশল-রাজের বাড়ির পথ আমায় দেখিয়ে দিতে পারেন। আমি সর্বহারা। দুঃখী কাঙাল। আমার যা কিছু ছিল, সব হারিয়েছি। সাগরে তরী ডুবে গেছে। ভূমিকম্পে ঘর-দুয়ার ভেঙে গেছে। সন্ন্যাসী কাঙালকে ইচ্ছে করে কাশী-রাজ দরবারে উপস্থিত হয়ে করজোড়ে নিবেদন করলেন—মহারাজ দয়া করে আমায় দান করুন। সে বিপন্ন, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বড় দুঃখে পড়েছে। আমি আপনার শত্রু-কোশলের হতভাগ্য রাজা। কাশী রাজ হেসে বল্লেন—ওগো মরণ বিজয়ী বীর। এই আপনার কৌশল। আজ হতে আপনার রাজ্য আপনাকে দিলাম। আপনাকে মরে। অমর হতে দেব না।

যৌবন অন্যায় রক্তপাতে কখনো উল্লসিত হয় না। সে পরাজয় স্বীকার করে, তবু। মনুষ্য বুকে তরবারি হানে না। ছার রাজ্যে, সিংহাসন দিয়ে কী হবে! যৌবনের বজ্র-বাহু দীন-দুঃখীকে পালন করে। তাকে চূর্ণ করবার জন্য কি সে এ শক্তির দান পেয়েছে? না, না, না।

.

**০৫. প্রেম ও যৌবন**

যৌবন উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে যুবকের সম্মুখে হয়তো কোনো এক প্রভাতে এক নূতন জীবনের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। এক নব উন্মাদনা বর্ষার প্রচণ্ডতায় তার হৃদয়-সাগর বন্যাবিক্ষুব্ধকরে তোলে। তার মনের অনুভূতির সঙ্গে কাম ও পাপের কোনো সংস্রব নাই। কাম তার পশু ভাব—প্রেম তার দেব ভাব।

কাম জীবনকে উন্নত করে না-বাসনার তীব্র পিপাসা উত্তরোত্তর বেড়ে তাকে সর্বনাশের গভীর গুহায় টেনে নিয়ে যায়। প্রেম তাকে সংযমী এবং মহৎ করে। দুঃখের বিষয় যুবকেরা এই বয়েসে প্রেমের নব উন্মাদনায় প্রায়ই পাপ পথে ধাবিত হয়—উন্মত্ত নারী সঙ্গ হতে বঞ্চিত থেকে এদেশে যুবকেরা প্রায়ই কুচরিত্রা রমণীর গৃহে আসা-যাওয়া করতে থাকে। ফলে তার পতন ও সর্বনাশ আরম্ভ হয়। এই জন্য আমাদের দেশের লোকেরা প্রেমকে অতি ঘৃণার চোখে দেখেন। প্রেমের অর্থ তারা বোঝেন—বেশ্যালয়ে গমন, পাপ এবং ব্যভিচারের পথে বিচরণ। আমাদের দেশে বিবাহের পূর্বে শতের মধ্যে ৯৯ জনই অবৈধ নারী সংস্রবে একবার না একবার জীবনকে পতিত করে। বাঙলার হাজার হাজার বেশ্যাকে রাজকন্যার হালে যারা রাখে তারা আমাদের যুবকেরা। এই বেশ্যার দল কোনো কাজে পরিশ্রম, কোনো পরিশ্রম সাপেক্ষ কাজ করে না—অথচ সংসারে খুব উচ্চ

অবস্থায় জীবন যাপন করে। এদের অন্নদাতা সংসারের শত শত যুবক যাত্রী। যাদেরকে সমাজ ধরতে পারে না, চোখে দেখে না, যারা প্রকাশ্যে সাধু! যুবক-যুবতাঁকে বৈধ ও ভদ্রভাবে অভিভাবকদের দৃষ্টির সম্মুখে কেন মিশতে দেওয়া হয় না, তা বলা যায় না। নারীকে একেবারে যুবকের দৃষ্টি হতে গোপন করে রেখে, দেশের নৈতিক আরও দূষিত করা হবে না? গোপনে অভিসারের পথে কে বাধা দেবে? মানব জীবনে প্রেমের যে একটা অতি মহৎ সার্থকতা আছে, সাধারণ শ্রেণীর মানুষ তা অনুভব করে না। প্রেম মানুষকে সংযমী, চরিত্রবান, বলবান, সাধনায় দৃঢ়বান করে–যুবককে সগ্রামশীল, মহৎ ও গৌরবশীল করে।

অশিক্ষিত সমাজ যুবক-যুবতাঁকে হাটের গরুর মতো বিক্রি করে জীবনে তাকে পঙ্গু অলস পশু করে ফেলে। ফলে তার জীবনে কোনো রসানুভূতি থাকে না। বলহীন, সাধনাহীন, পশু সে কামনা করে। গোবেচারী বোকা সহজ মানুষ যারা,–তারা জীবনকে অবস্থার সঙ্গে মানানসই করে নেয়। আত্মায় যাদের আগুন আছে তারা এ জগতের আশা, বাসনা, আনন্দ, আকাঙক্ষা ত্যাগ করে মহত্ত্বের শান্তি পেতে পরকালের জন্য সহিষ্ণু হয়ে অপেক্ষা করেন। অথবা একটা বৃহৎ ত্যাগ ও বৈরাগ্য তাদের জীবনকে কঠিন যন্ত্রণা দেয়। না হয় সে উচ্ছৃঙ্খল, বেশ্যাসক্ত, পথহারা, বাঁধনহারা যথেচ্ছাচারী জীবন যাপন করে। শেষকালে হয় পথে, না হয় ঘরে সান্ত্বনাহীন, আনন্দহীন, দুঃখের জীবন যাপন করে, দুঃখের মরণ মরে।

কবি মধুসূদন শেষ জীবনে কৃতকর্মের ফলে শোচনীয় ভাবে মরণ বরণ করেছিলেন। জনৈক সহৃদয় বান্ধব স্বীয় লাইব্রেরির গৃহে পীড়িত কবি, তার পত্নী এবং ছেলেপেলেগুলিকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। সাহায্য করে করে সবাই সরে গেছে। আর এখন কেউ সাহায্য করে না। সেবাকারিনী যখন ঔষধ-পথ্য নিয়ে তার পত্নীর কাছে উপস্থিত হলেন, মহৎ হৃদয় প্রেমিকা পত্নী বললেন–আমার জন্যে কোনো সেবাযত্নের প্রয়োজন নাই–আমার স্বামীর জীবন রক্ষা করুন। এই কথা বলেই তিনি প্রাণত্যাগ করলেন।

**০৬. বাঁধন হারা**

এক শ্রেণীর যুবক আছে। তারা খুব যে বড়লোক তা নয়। এমন কি তাদের পিতা-মাতা হয়তো খুব কষ্ট করেই সংসার চালাচ্ছেন, পরিবারস্থ নির্ভরশীলদের অন্ন-বস্ত্র দিচ্ছেন। এইসব পরিবারের দায়িত্বজ্ঞানহীন যুবকেরা সিঁথি কেটে, ছেঁড়া কাপড়খানি কুঁচিয়ে ছিন্নপথ ঢেকে, পথে পথে দলবদ্ধ হয়ে, বাড়ি বাড়ি খেলা করে, গল্প করে দিনের পর দিন ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। খাবার সময় খেতে আসে, বাকি সময় ইয়ার্কি দিয়ে বেড়ায়, তাস খেলা, জটলা বেঁধে বেড়ান এদের কাজ।

সংসারের কোনো ধার এরা ধারে না। উপায় উপার্জনের কোনো চেষ্টা নাই। যেন পরম নির্ভরশীল সাধু দরবেশ! ভবিষ্যৎ চিন্তা এদের মোটেই নাই।

পরস্পরে এদের বন্ধুত্ব খুব বেশি–একজন আর একজনের জন্য প্রাণ দিতে পারে।

পিতা-মাতার ভর্ৎসনা, কোনো গুরুজনের উপদেশ, এদেরকে সজাগ সতর্ক করে না। বৃদ্ধ তার পীড়িত পিতা এদের সঙ্গে পেরে ওঠেন না। মা কথা বলে ছেলের কাছে অপমানিতা হন। এরা লেখাপড়া বিষ চোখে দেখে।

এইসব যুবকের ভবিষ্যৎ যে কত ভয়ানক তা বলা যায় না। চিরদিন এ সুখের দিন থাকে না, ক্রমশ দুঃখের দিন ঘনিয়ে আসে। পিতা-মাতার অন্তর্ধানে সংসারের সু-কঠিন চাপে এদের দুর্দশার সীমা থাকে না–তখন ঘোর অনুতাপ ও মর্ম যন্ত্রণায় এরা অস্থির হয়ে ওঠে–কিন্তু সে অনুতাপ ও অস্থিরতায় কোনো লাভ হয় না। বড় বড় শহরে এই শ্রেণীর যুবকেরা বাড়ি ঘর ছেড়ে চুরি, লাম্পট্য, জুয়াচুরি এবং অতি মন্দ পথ অবলম্বন করে। ক্রমশ এইভাবে কিছুকাল চলতে থাকে, কেউ জেলে যায়। এদের যতই আঘাত করা যায়, ততই এরা যেন ভয়ানক এবং হিংস্র হতে থাকে।

আলস্যে যৌবন কাটিয়ে দিলে জীবনে দুঃখের অন্ত থাকে না। যদি লেখাপড়া না হয়ে থাকে, তবে অনুতপ্ত হও, কুসঙ্গ ত্যাগ কর। আকাশ ভেঙ্গে গুড়ো করবো, পাহাড় ভাঙ্গবো–এইসব আস্ফালন ত্যাগ কর। কোনো শিল্প শিক্ষা কর, তাহলে জীবনে সুখী হতে পারবে। ইতর লোকদের হাতে বহু লাভজনক শিল্প আটকা পড়ে আছে। সেগুলি যদি ভদ্র সন্তানেরা নিজ হাতে গ্রহণ করে, তবে অর্থের অভাব থাকবে না।

নীচ-হীন পন্থা, চুরি, দুষ্কার্য, প্রতারণা, ছলনা, ঘুষ, পল্লী গ্রামের লোকদের কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে, নারী বিক্রয় করে অর্থ উপার্জন করা বড়ই ঘৃণিত কথা। যদি শরীরে শক্তি থাকে, তবে কৃষি কাজও করতে পার। বন্ধুদের সঙ্গ লাভে জীবনটা নষ্ট করো না। বিপদকালে কোনো বন্ধু তোমার কাছে আসবে না। পরম আত্মীয় যারা, তারাই তোমার দুঃখ-বিপদের সময় সহায় হবে। তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে জীবনকে মূল্যবান করে গড়ে তুলতে চেষ্টা কর। কাজে লেগে যাও। কারো সঙ্গে জল্পনা কল্পনা, পরামর্শ করে সময় নষ্ট করো না–কাজে লেগে যাও। পথে পথে ঘুরে বেড়ান, সংসারের কোনো ধার না ধারা, গুরুজনদের অবাধ্য হওয়া, গুরুজনদের সঙ্গে তর্ক করা, এসব বড়ই খারাপ।

যৌবনকালে ছেলেরা কুসঙ্গে পড়ে নেশা করতে শেখে। শহরের ছেলে হলে এমন কি বেশ্যাবাড়ী যেতে শেখে। যুবকেরা গুরুজনের অগোচরে সর্বনাশের পথে হাঁটে। একবার পাপের পথে যাওয়া আরম্ভ করলে সেই অভ্যাস আর কাটে না। এক নারী ছেড়ে আর এক নারী, এক বেশ্যা ছেড়ে আর এক বেশ্যার কাছে যেতে প্রাণ চায়! বেশ্যাদের ব্যাধিপূর্ণ শরীরের সংস্রবে এসে সোনার শরীর ধ্বংস হয়–গণোরিয়া, উপদংশ প্রভৃতি পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে অকালে প্রাণ হারাতে হয়! দূর থেকে মনে হয় বেশ্যাদের কাছে যেন কী স্বর্গীয় বস্তু আছে–কিন্তু অমন সর্বনেশে ভয়ানক বিপদ-উৎস আর নাই। দূর থেকে বেশ্যাদের রূপ, আগুন মনে করে পালিয়ে আসবে।

কতগুলি যুবক মনে করে, চাকরি করলে জীবনের হীনতা প্রকাশ পায়। সেবার দ্বারা জগৎ চলবে। যে কোনো চাকরি কর–উপরের কর্মচারীকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি কর। চাকরিতে কখনও জীবনের হীনতা মনে কারো না। তুমি সামান্য চাকরি করেও যদি ঐখানে তোমার কর্তব্য পালন করতে পার, তা হলে তুমি মহৎ এবং শ্রেষ্ঠ বলে গণিত হবে। ইতালীর যে নগরদ্বয় আগ্নেয়গিরির ভস্মপাতে ধ্বংস হয়েছিল, সেই ভস্ম মধ্যে অনেককাল পরে দেখা গিয়াছিল, এক কর্তব্যনিষ্ঠা সৈনিক বন্দুক হস্তে শেষ পর্যন্ত আপন কর্তব্য পালন করে জীবন দিয়েছেন। তিনি সামান্য সৈনিক হয়েও মহৎ এবং নমস্য।

একজন সামান্য পিয়ন হয়েও তুমি জীবনের মহত্ত্ব বজায় রাখতে পার। উপরের কর্মচারীর অবাধ্য হওয়া, তাকে অশ্রদ্ধা করা প্রকৃত সজ্জন ব্যক্তির কার্য নহে। যুবকদের মনে অবাধ্যতা, ঔদ্ধত্য একটা বিশেষ আদরের জিনিস।

অপরিচিত গুরুজন, বয়োজ্যেষ্ঠ নরনারীকে 'তুই তুই' করে কথা বলা, হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে দুর্বল নর-নারীকে অপমান করা, প্রহার করা বড়ই অসভ্যতা। যৌবনকালেই অধিকতর বিনয়ী, সভ্য ও ভদ্র হওয়া উচিত। গায়ের জোর চিরদিন সমান থাকে না। যৌবন-শক্তি দুর্বলকে রক্ষা করে, সাহায্য করে সার্থক ও সুন্দর হয়। মারামারি ও অত্যাচারে যদি যুবকের ঐ মুষ্টির অপব্যবহার হয়, তাতে ঈশ্বরের দানের ঘোর অপচয় হয়–যুবকেরা তা বিশ্বাস করবে কি?

মুসলমান সমাজে কুসঙ্গের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। সৎ কথা, সদালাপ, সৎ উপদেশ যেন . একেবারেই সমাজ হতে উঠে গিয়েছে।

পরমুখাপেক্ষী না হয়ে, স্বাধীনভাবে পরিশ্রম করে যৌবনকে সার্থক কর। যৌবন যদি বৃথা নষ্ট করে ফেল–হঠকারিতা, প্রগলভতা, বাচালতা, বিলাসিতা, চরিত্রহীনতা প্রভৃতি দ্বারা জীবন নষ্ট করে ফেল, তা হলে শেষকালে অনুতাপ করেও কোনো ফল হবে না।

**০৭. যুবকদের কর্কশ কণ্ঠ ও অন্ধবুদ্ধি**

যুবকেরা যৌবনকালে সাধারণত অসহিষ্ণু হয়ে কর্কশ ঝাঝালো কথা বলে। ভদ্রতা, বিনয়, ধীরতার মূল্য তারা আদৌ অনুভব করে না। কি গৃহে, কি বাহিরে সর্বদাই অপেক্ষাকৃত হীন পদস্থ বা দুর্বল-শক্তি নর-নারীকে, এমন কি স্নেহ রসাÉ গুরুজনকেও কঠিন কণ্ঠে কথা বলে। সময়ে সময়ে এজন্য তারা যথেষ্ট অপদস্থ হয়। সময়ে শিক্ষা হয়, সময়ে শিক্ষা হয় না–উত্তরোত্তর রূঢ়তা ও স্বভাবের উগ্রতা বাড়তে থাকে।

অযথা আস্ফালন করাও তাদের স্বভাব। আত্ম-গৌরব, বংশগৌরব করে অপরকে হীন ও ছোট প্রতিপন্ন করতে তারা কোনো লজ্জাবোধ করে না। নিজের সম্বন্ধে অযথা একটা উচ্চ ধারণা পোষণ করে। ফলে বহুস্থানে, জীবনের অনেক কাজে ঠকতে হয়।

বৌকে প্রহার করাও তাদের এ বয়সের একটি রোগ হয়ে দাঁড়ায়। মানুষকে উপহাস করা, পেছনে দাঁড়িয়ে বিদ্রূপ করা, মানুষের গ্লানি করা, দুই চারজন যুবক এক জায়গায় বসে–লাটকে ফকির করা, ফকিরকে লাট বাহাদুর করা, মানুষের চরিত্র সমালোচনা করা পথে পথে ঘুরে বেড়ান, নিজের ভবিষ্যৎ ভাবনা ভুলে যাওয়া, দুর্বল মাকে উপেক্ষা করা, তাস, পাশা খেলা, সর্বত্র হঠকারিতার পরিচয় দেওয়া, বিচারশূন্য হয়ে মানুষকে মারা এবং অপদস্থ করা, তাদের দৈনিক স্বভাব হয়ে দাঁড়ায়। যুবকদের নিয়ে কাজ করা, বড়ই বিপদ। অসংযত চরিত্র, উদ্ধত স্বভাব, নিয়ম-বিদ্রোহী যুবকদের নিয়ে চলা এক সমস্যার বিষয়।

জায়গার বলে আস্ফালন করা, অগোচরে প্রতাপের পরিচয় দেওয়া, কোনো বিষয় ডিক্রি দেওয়া, ডিসমিস করা, তিন তুড়িতে উড়িয়ে দেওয়া, অন্তসারশূন্য পদ গরিমা এবং শক্তিমত্তার পরিচয় দেওয়া যুবক জীবনের মস্ত বড় বোকামি। লাট সাহেবের চাইতে বেশি নবাবি চাল মারা কোনো কোনো যুবকের প্রকৃতি। ঘরের মধ্যে তেজস্বিতার পরিচয় দেওয়া, আপন স্ত্রীর কাছে মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, দাম্ভিকতা প্রকাশ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অগোচরে মানুষকে সম্মানের সঙ্গে লোক সমক্ষে ধরাই ভদ্রতা এবং মনুষ্যত্ব। কোনো কোনো লজ্জাহীন যুবক সারাজীবনেও এই অযথা আস্ফালন বর্জন করে না। জীবনে যতই

তারা ছোট হতে থাকে; ততই দাম্ভিকতার পরিচয় দেয়। যে যত হীন সেই অগোচরে মানুষকে তত অসম ও তাচ্ছিল্য করে কথা বলে। তাদের নিজ পুত্রকেও এইভাবে কথা বলতে শিক্ষা দেয়। উচ্চ গরিমাব্যঞ্জক হাসিও এই বয়সের স্বভাব। কোনো কোনো যুবক অন্তরকে সুন্দর করার ইচ্ছা বর্জন করে এই বয়সে বাইরের সাজ-সজ্জা নিয়ে অতি মাত্রায় ব্যস্ত হয়। শেষকালে হয়তো তাদের মাথায় তেল জুটে না। নিজের সম্বন্ধে অযথা মিথ্যা গর্বিত ধারণা, অতিরিক্ত শঠতা ও বাচালতা যুবকদের সর্বনাশ করে।

.

**০৮. পরের বুদ্ধি**

যে যুবক পরের বুদ্ধি গ্রহণ করে, সে মরে। অথচ এই বয়সে যুবকদের অসংখ্য পরমার্শদাতা, যদিও হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু জুটে না। যার যা ইচ্ছা তাই বলুক–নিজে মুক্তি ও জয়ের পথ ভেবে নিয়ে অবিচলিতভাবে সে পথে চলা উচিত। কেউ কারো জীবনের গুপ্ত রহস্য অনুভব করে না। জীবনের কল্যাণ-সন্ধানের পথে এদেশে প্রজ্ঞাবান স্নেহের গুরু, পিতা ছাড়া কাউকে গ্রাহ্য করা উচিত নয়। পিতার কাছে জ্ঞানে না হলেও, স্নেহ ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতায় নত হতে হয়। তাতে ক্ষতি হলেও। আত্মশক্তি নিজের ব্যক্তিত্ব এবং নিজের স্বাধীন বিবেকবুদ্ধিতে বিশ্বাস চাই–বহু মত বহু সমালোচনায় জীবনের সমস্ত কার্যে সর্বনাশও হয়। নিজের গলায় ফাঁসি দিয়ে কোনো ব্যক্তিবিশেষের হাতে, তিনি যতই মহৎ হউক না কেন, তুলে দেওয়া আদৌ ঠিক নয়। ওতে যুবকের মনুষ্যত্ব একেবারে পশু হয়। বয়োজ্যেষ্ঠ, সম্মানী, ধনী, শিক্ষিত সাধু এবং গুরুজনকে সম্মান করা অন্যায় নয়। দেশের ও সমাজের রীতি অনুযায়ী তাদের আনুগত্য স্বীকার করা উচিত–ওতে মানুষ কখনও ছোট হয় না। ভিতরে যদি গুণ গরিমা থাকে–তবে মানুষ তোমাকে আপনাআপনি উচ্চস্তরে টেনে নেবে। মানুষের কাছে নত ও বিনয়ী হলে, কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। দুবৃত্ত, শয়তান কদাচারী মানুষকে অন্তর দিয়ে কখনও শ্রদ্ধা করা উচিত নয়। এইখানে যুবকের সত্য-সন্ধানী বিদ্রোহী-চিত্তের আরও বিদ্রোহী হওয়া উচিত। অযথা ভয়ে যুবক যেন অস্থির না হয়। তার নমস্য ও উপাস্য একমাত্র আল্লাহ্ সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের ভাবব্যঞ্জনা, অক্ষর দু'টিতে মিলিত হয়েছে। আলাদাভাবে ঐ অক্ষর দু'টির কোনো মূল্য নেই–ঐ শব্দেরও কোনো সম্মান নেই। তা যেন যুবকের মনে থাকে।

মনের সংকল্প কাউকে বলতে নেই। সংকল্প ঠিক করে কাজে লেগে যাও। ঘরকুণোর কখনও জীবনে উন্নতি হয় না। অত্যধিক গৃহপ্রীতি, বিদেশে যেতে ভয় করা–বড়ই দোষের। অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। মানুষের জন্য সাহায্য এবং বিপদ সব জায়গাতেই আছে। শরীরে যতদিন শক্তি সামর্থ্য আছে ততদিন বিদেশ করতে ভয় করতে নেই। মানুষের জন্যে চিরদিন বাঁধা পথ থাকে না।

গৃহ এবং বিশ্রাম বার্ধক্যের আশ্রয়। যৌবনকালে পৃথিবীর সর্বত্র ছুটে বেড়াও, রত্ন মাণিক্য আহরণ করে গৃহে সঞ্চিত কর, যাতে বৃদ্ধকালে সুখে থাকতে পার। যৌবনকালে যেমন আয় তেমনি ব্যয় করা সংসারী লোকের কাজ নয়। এ হচ্ছে নিতান্ত অপদার্থ লোকের কাজ। চিরজীবন পরিশ্রম করে যদি বৃদ্ধকালে অনাহারে মরতে হয়, তবে আর যৌবনে এত পরিশ্রম কেন করলে? বৃদ্ধকালে কি কাজ করবার ক্ষমতা থাকে? তখনকার জন্যে পূর্ব হতে সতর্ক হতে হয়–যে হয় না তার অনুতাপই হয় সার। আপন বাহু যখন শেষকালে বাধ্য থাকে না, তখন অপরের কথা, আপন সন্তানদের কথা কি বলা যায়?

মানুষের উপদেশের অন্ত নেই। কতজন যে কত রকম কথা বলে তা শুনলে মাথা ঠিক থাকে না। নিজেই ভেবে-চিন্তে যা ভালো বোঝ, সমস্ত শক্তিতে তাই করতে থাক। যা হয় তাই হবে, হয় জয়ী হবে না হয় ঠকবে। জায়গায় বসে কেবল চিন্তা করা, লাভ-লোকসানের কথা ভাবা মূর্খ লোকের কাজ। এরূপ লোক কোনো কাজ করতে পারে না। জীবনের সব সময়ে যে জয়ী হবে, তার কোনো মানে নাই। হারতেও হয়।

.

**০৯. যুবকের ভবিষ্যৎ চিন্তা**

আজিকার প্রচুরতায় শান্ত হয়ে থাকা ঠিক নয়। সংসারে ক্রমশ জনসংখ্যা বাড়ে, লোক লৌকিকতা বাড়ে সুতরাং খরচ বাড়তেই থাকে। রাজা হবো, বাদশা হবো, বড়লোক হবো–কখনও জীবন এরূপ দুরাশা পোষণ করতে নেই। এরূপ লোকের ভাগ্যে ভস্মও জোটে না। যৌবনকালে বৃথা বসে না থেকে অর্থ সঞ্চয়ের দিকে মনোনিবেশ কর। অবশ্য জমাজমি থাকলে, ক্ষেত-খামার থাকলে, সেগুলি দেখে-শুনে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে চেষ্টা করাও মন্দ নয়। দিন-রাত্রি তাস পিটান, সংসারের কোনো কাজ না করা, দিন-রাত্রি ঘুমান আর বছর বছর পুত্র-কন্যার পাল বাড়ান অলক্ষ্মী লোকের কাজ। এ সুখের দিন চিরকাল থাকবে না। পূর্ব হতে সতর্ক হও।

মুসলমান ছেলেদের ভবিষ্যৎ চিন্তা মোটেই নাই। পরের ঘাড়ে চেপে বসে খেতে পারলে, যেন এরা আর নড়তে চড়তে চায় না। বয়স্ক হয়েই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হয়ে নিজের আর্থিক উন্নতির পথ সন্ধান করবে। যে সমস্ত যুবকের সঞ্চয়ের বুদ্ধি নাই, যারা কোনো কাজকর্ম করে না বা শিখতে চেষ্টা করে না, শুধু টো টো করে ঘুরে বেড়ায়, যারা ঘোর আলস্যপরায়ণ–তাদেরকে নির্মমের মতো বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়াও মন্দ নয়। যে তাকে অন্ন দেয়, সেই তার ক্ষতি করে। এই সমস্ত যুবকদের প্রতি কোনো রকমে দয়ার্দ্র হবে না। অভাবে মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে না–তার জীবনে দুঃখের অবধি থাকে না। অভাব ও দারিদ্র্যকে পাপ বলা যায়। এহেন অভাব দুঃখে যে সতর্ক হয় না, তাকে গৃহ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত। পিতামাতাকে সুখী না করুক সে নিজে সুখী হোক। ১৩ নং শিব নারায়ণ দাস লেনে সিদ্ধিশ্বর মেশিন প্রেস এবং সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীর মালিক একদিন বলেছিলেন–"আমি বাড়ি থেকে মাত্র এক টাকা পাঁচ আনা নিয়ে যাত্রা করি। এক্ষণে আমার ব্যবসার মূল্য এক লক্ষ টাকা। যে বাড়িতে বসে থাকে সেই মরে। বহু টাকা নিয়ে কেউ কখনও জীবনে উন্নতি করতে পারে না! আঘাত, অভিজ্ঞতা, সহিষ্ণুতা, বিনয়, সততা ব্যতীত কোনো কালে কারো উন্নতি হয় না।

যুবকদের আর একটা দোষ হচ্ছে অসহিষ্ণুতা। কোনো কাজেই ধৈর্য নাই। অতিরিক্ত বুদ্ধিমান হলেই স্বভাবে সহিষ্ণুতা থাকে না। যার স্বভাবে সহিষ্ণুতা নাই সে কোনোকালে কোনো কাজে উন্নতি করতে পারে না। লোকের সঙ্গে কলহ, ঝগড়া, কচকচি, চাকর বাকরদের প্রতি কাজে ভুল ধরা, মানুষকে সর্বদা গালি দেওয়া, সর্বদা মত বদলান, এ কাজ ছেড়ে ও কাজ করা, রাতারাতি মানুষ হবার ইচ্ছা করা, গুরুজনে অবাধ্য হওয়া, সম্মানী লোককে সম্মান না করা–এসব যুবক জীবনের মস্ত বড় দোষ।

যা হয় হবে, না হয় ভিক্ষা করে খাব, আল্লাহ মুখ দিয়েছেন, আহার দেবেন, এসব দরবেশী কথা অপদার্থ যুবকদের মুখে শোভা পায়। এ কাজ ভালো নয়, ও কাজ ভালো নয়, ওতে মান যায়, এসব কথা ভাবতে নেই। যতক্ষণ লজ্জা, মান, ভয়, আছে ততক্ষণ উন্নতির কোনো আশা নেই। আপন দেশে কাজের কোনো সুবিধা হয় না–দূরদেশে চলে যাওয়াই ঠিক।

ইতর জীবের ভবিষ্যৎ চিন্তা নেই। মানুষের সর্বদা ভবিষ্যৎ চিন্তা আছে। আজিকার যৌবনের একটি দিনের মূল্য বার্ধক্যের এক বত্সরের সমান, অতএব হেলায় যৌবনকাল নষ্ট করা উচিত নয়। উপায় করতে না শিখে বিবাহ করা যার পরনাই বোকামি, ওতে জীবনের জঞ্জাল বেড়ে ওঠে। বিবাহ যদি করেই থাক তা হলে অধিক জঞ্জাল বেড়ে ওঠবার আগে উপার্জনের জন্যে বিদেশে ছুটে পড়। অভাবে পরিবারসুদ্ধ মরবার চাইতে একজনের মরাই ভালো।

কোথায় স্কটল্যান্ড, ইংল্যাণ্ড, আয়ারল্যান্ড–সেখানকার যুবকেরা বাঙলার বুকে অর্থ উপার্জনের জন্যে চলে আসেন। ময়মনসিংহ জেলায় স্কটল্যাণ্ডবাসী দুটি যুবকের পাশাপাশি দুটি সমাধি দেখেছিলাম, যেন দুটি পুষ্প-আপন-আত্মীয়-পরিজনের সুখের জন্যে জীবনের মায়া ত্যাগ করে কোনো দূর দেশে এসে চিরদিনের জন্যে চিরদ্রিায় অভিভূত হয়ে অন্তরের জন্য শ্যামল সমাধি শয্যা গ্রহণ করেছেন। ঘরকুনো মুসলিম যুবকের এ দৃশ্য দেখে কি শেখবার নেই। কলকাতা ব্রিস্টল হোটেলের মালিক প্রথম জীবনে এক অতি দরিদ্র ব্যক্তি। ছিলেন! পরিশ্রম, সহিষ্ণুতা এবং অধ্যবসায় গুণে তিনি ক্রমে কোটিপতি হয়ে প্রাসাদতুল্য হোটেলের স্বত্বাধিকারী হতে পেরেছিলেন।

### ১০. যুবকদের নীতিহীনতা

যুবকেরা ধর্মের ধারও ধারে না। ঈশ্বর-ভক্তি, ঈশ্বর-ভীতি, ধর্ম-ভাব যদি যৌবনকালে না থাকে, তবে সে জীবনের কোনো উন্নতি সম্ভব নয়। সততা, নীতিনিষ্ঠা, সত্যনিষ্ঠা, ঈশ্বর প্রেম এসব যদি যৌবনকালে না হয় তবে কি আর বুড়াকালে হবে?

যৌবনকালে যুবকেরা অন্যায়, অধর্ম, জুয়াচুরি, প্রতারণা করতে যেন বাহাদুরী বোধ করে। ঈশ্বর কী, ধর্ম জিনিসটা কী, ভুলেও ভেবে দেখে না। গায়ের জোরে গর্জে বেড়ায়–এ যে কতবড় অন্যায়, তা বলবার নয়। যেন যুবকদের ধর্ম-কর্ম এবং ঈশ্বরের কোনো সংশ্রব নেই–যেন ওটা বুড়োকালের জিনিস।

সততা, বিনয়, সত্যনিষ্ঠা, ঈশ্বর-ভক্তি, ঈশ্বর-ভীতি এই-ই ধর্ম জীবনের সার বিষয়। রোজা-নামাজেই ধর্ম পালন হয় না। সারা জীবন অসম্ভবে যাপন করে বুড়াকালে রোজা নামাজ করে ক্ষতি পূরণ করে দেব–এইরূপ ইচ্ছাই অধিকাংশ যুবক পোষণ করেন। এরা

যে কত বড় নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক তা বলবার নয়। যে অভ্যাস যৌবনে হয় নাই। বার্ধক্যে তা হবে না। যার জীবন একবার কদর্য হয়েছে, সে কি আর বুড়াকালে ভালো হয়? বুড়াকালে সে আরও পাকা শয়তান হয়। তার জীবন ও স্বভাবে শয়তানী ভাব পাষাণের দাগের মতো বসে যায়–তার জীবনের আর পরিবর্তন হয় না–হাজার বার নামাজ পড়লেও না। সততাই মনুষ্য জীবনের ধর্ম–নামাজ তার বাহ্যিক পরিচয়–একটি সামাজিক ধর্ম। আসল ধর্মের সঙ্গে ওর কোনো সংশ্রব নাই। যুবক জীবনে বিচার চাই, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান চাই। স্বভাবে বিনয় চাই। গুরুজনের প্রতি ভক্তি চাই। নীতি, নিষ্ঠা, সততা, সাধুতা, ন্যায়নিষ্ঠা আমাদের দেশে স্বপ্নের বিষয়। কি হিন্দু, কি মুসলমান এদের ধর্মের যেন নীচতা, মিথ্যা, ছলনা, প্রতারণা করতে

লজ্জা বোধ করে না। জীবনের সংস্কারের সঙ্গে যেন ধর্ম জীবনের কোনো সংশ্রব নেই। এদের ধর্ম হচ্ছে নতুন কাপড়, ঢাক-ঢোল, মুখস্থ পড়া এবং উঠা-বসা করা। আত্মার সঙ্গে ধর্ম জীবনের কোনো সংশ্রব নেই। লেখাপড়া শিখেই ছেলেরা কোনো ফাঁকে চুরি করে, বাটপাড়ি করে দুপয়সা অর্জন করবে–সেই হয় এদের শ্রেষ্ঠ চিন্তা। বিচার, বিবেক, মিথ্যার সঙ্গে জীবনের সংগ্রাম–এদের ধর্মে লেখে না। এদেরকে সুসভ্য জাতিরা বর্বর ছাড়া আর কী বলবে! ছিল সবই, আছেও সব–দেশের নিকৃষ্ট শ্রেণীর হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সংখ্যা বাড়িয়েছে মাত্র। ইসলাম ধর্ম অনুভব করে নাই। ইসলাম ধর্মের প্রথম বিশ্বাস মন্ত্রের অর্থ প্রভাব এদের আত্মায় কাজ করে নাই। ফলে এরা জোর অধর্মের নরককুণ্ডে পড়ে মানব সমাজকে দূষিত করছে। নিজেরা তো সুখী নয়ই–পরিবার, গ্রাম, সমাজ সকলকে দূষিত করে চলেছে। যে জাতি বা যে মানুষের পাপ ও মিথ্যার সঙ্গে বিরোধ নেই, তার কোনো ধর্ম কর্ম নেই। তার ধর্ম কর্ম একটা তামাসা মাত্র। এক নামাজি নারীকে ডিম চুরি করতে দেখেছি, হুবহু মিথ্যা কথা বলতে শুনেছি–অথচ এই নারী জীবনাবধি কোনোদিন নামাজ অর্থাৎ উপাসনা ত্যাগ করে নাই। ঈশ্বর অর্থাৎ আল্লা কি, কোরান কি, কোরানে কি লেখা আছে, পরকাল কি–এ-সব এরা কিচ্ছু জানে না। এরা জীবন একভাবে যাপন করতে যায়। বুড়া কালে বার্ধক্যে নামাজ-রোজা করে। অর্থ হলে হজ্ব করে, কোরবানি করে, ছেলেদের খাত্তা দেয়–এই হচ্ছে এদের ধর্ম। জগতের উন্নতি, দশজনের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করা, বাড়িতে দালান-কোঠা তোলা, পুকুর কাটা–এই হল এদের জল্পনা-কল্পনা। অবস্থাশালী হলে মুসলমানেরা প্রায়ই অত্যাচারী হয়। মনুষ্য জীবনের কর্তব্য কি, তা এরা জানে না। কেউ যদি খুব বেশি ধার্মিক হয়, সে কোনো পীরের কাছে মুরিদ হয়। পীরের কাছে পরকালের মুক্তির চাবি আছে, এই বিশ্বাসে এরা মাঝেমাঝে পীরকে টাকা দেয় এবং আশ্বস্ত হয়ে বসে থাকে। কি নর কি নারী আত্মার দিক দিয়ে এরা একেবারে মৃত। অতি হীন আলাপই হচ্ছে এদের প্রাত্যহিক কথার বিষয়। ‘ যৌবনকালে কি বিবাহিত কি অবিবাহিত, পাঁচজন একস্থানে জমা হয়ে অতি জঘন্য অতি কুৎসিত আলাপ করা যুবকদের বড়ই প্রিয় অভ্যাস। নারীর অঙ্গ নিয়ে এরা যে জঘন্য আলাপ করে, তা প্রকৃত মনুষ্য সন্তান শুনলে তাদেরকে একপাল বিষ্ঠাভোগী কুকুর বলবেন। কতভাবে, কত রকমে যে এরা নারী অঙ্গের সমালোচনা করে তার ইয়ত্তা নাই। হায়, নারীদেহে কী আছে? মূত্র–বিষ্ঠাপূর্ণ, কুৎসিত দর্শন মূত্রস্থান নিয়ে কী উৎসাহপূর্ণ গবেষণা। হায়, মনুষ্য! তুমি না দেবতার পুত্র? তুমি কি কুকুর-শাবক? তোমার এই প্রবৃত্তি? কী জিনিসে তুমি এত মুগ্ধ? ওরে অন্ধ যুবক! তুই এত পাগল? ইন্দ্রিয় লালসা তৃপ্তিতে কতটুকু সুখ! এই তুচ্ছ সুখের জন্যে তোর সোনার যৌবনকে কীভাবে মাটি করে দিস! হায়, পাগল! একবার ভালো করে বুঝে দেখ। ঐ পাপ আলোচনা করে জীবনের সর্বনাশ করিস নে। দেহস্থ পবিত্র শক্তির আধার বীর্যকে নষ্ট করে জীবনের সুখ শান্তি নষ্ট করিস নে। ঐ বীর্যের মতো মূল্যবান জিনিস আর নাই-ওর মূল্য রাজার রাজত্ব থেকে অনেক বেশি। তুই কি অবোধ পাগল দলের একজন হবি? শয়তানের প্রলোভনে পড়ে তোর চোখে-মুখে দুর্গন্ধ পুরীষ মাখাস নে। আঃ ছিঃ ছিঃ।

### ১১. যুবকের ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ আত্মবিশ্বাস, দাম্ভিকতা এবং অহঙ্কার

প্রথম জীবনে যুবকেরা খুবই লম্বা কথা ছাড়ে। তার ধারণা সংসারে তার মতো বুদ্ধিমান আর কেউ নাই। জ্ঞানবৃদ্ধ পিতাকেও সে মনে মনে এবং প্রকাশ্যে মূর্খ এবং ভ্রান্ত মনে করে। যেন এ জগতে তার মতো জ্ঞানী বুদ্ধিমান আর দ্বিতীয়টি নাই। ভবিষ্যতে সে যে কি একটা মহাজন হবে, সে কথা ভেবেও সে ঠিক করতে পারে না। সংসারের সমস্ত জনই তার কাছে বোকা। সে যে কাজে হাত দেবে তাতেই সে জয়ী হবে নিশ্চয়! দুর্ভাগ্যক্রমে হতভাগ্য পিতা যে কয়দিন বেঁচে আছে, সে কয়দিন সে তার বুদ্ধি, চাতুরী কাজে লাগাতে পাচ্ছে না! পিতা বেটা কতদিনে সংসার ত্যাগ করে যাবে! রাত-দিন ফ্যাচ ফ্যাচ করতে আছে।

মায়ের কাছে পিতৃনিন্দা এবং বিবাহিত হলে পত্নীর কাছে নিজের বাহাদুরি এবং রাজ্যের লোকের নিন্দা করা তার কাজ। প্রথম জীবনে ভাবে, সে কম হলেও একজন হাকিম হবে, তার পর যখন লেখাপড়া আর ভালো লাগে না তখন ভাবে লেখাপড়া শিখে কে কী করেছে! সে একজন বড় ব্যবসায়ী হয়ে লক্ষপতি হবে। সংসারে সে যে অবাধে একজন বিশিষ্ট লোক হবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

তার মুখে সদাই তাচ্ছিল্য লেগে থাকে। সামান্য কারণে, সামান্য কথায় ম্যাচের কাঠির স্পর্শে দপ করে জ্বলে ওঠে। সর্বদাই রেগে আগুন হয়ে থাকে—যেন সকল মানুষই তার কাছে অপরাধী। সে ভাবে তার চিন্তা ধারা নির্ভুল, তার কাছে কোনো গলদ নাই।

কিন্তু এই ধরনের আত্মবিশ্বাস যে কত ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ, তা যুবকেরা নিজেরাই কিছু দিনের মধ্যে বুঝতে পারে। তখন বুঝে আর কোনো ফল হয় না।

ক্ষুদ্র অবস্থা থেকেই বড় হতে হয়। রাতারাতি বড় মানুষ হবো, প্রথমেই চেয়ার-বেঞ্চ খাঁটিয়ে সাহেব হয়ে জীবনে নামজাদা লক্ষপতি হবার আকাঙক্ষা যদি করে থাকে, তবে শেষকালে মজুরের সৌভাগ্যও লাভ হবে না। প্রথম জীবনে, জীবন যাত্রার আরম্ভে মান অপমান জ্ঞান ত্যাগ করে মজুর সাজ। বড় ঘরের বন্ধু-বান্ধব বা স্বশ্রেণীর বন্ধু-বান্ধবদের সমালোচনাকে ভয় করো না-লোকে যদি তুই করে কথা বলে, তা হলেও দুঃখিত হয়ো না। ঐগুলি হচ্ছে তোমার উন্নতির পথে শিক্ষা। কেউ তোমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুক বা না করুক-গ্রাহ্য করো না। নীরবে, নত মাথায়, মুখ বুজে ছোট হয়ে নিজের কর্তব্য করে যাও। দিন-রাত্রি উন্নতির চিন্তা করো না, কর্তব্য করে যাও।

যদি উন্নতি করতে চাও, তবে বিবাহিত হও, অবিবাহিত হও (বিবাহিত না হওয়াই ভালো) নারীর চিন্তা বিষবৎ বর্জন করবে। নারীর চিন্তা যদি মনে ঢোকে তা হলে কোনো উন্নতির আশা করো না। নারীর কথা যতই ভাববে ততই অধঃপতনের পথে যেতে থাকবে। প্রথমে যোগ্য হও, তারপর সুখ আপনাআপনি চারদিক থেকে হেঁটে আসবে। বিশেষ করে আমাদের দেশে নারী কখনও জীবনের সহায় নয়। তারা সকল ক্ষেত্রেই জীবনের মস্তবড় বাধা। নারীর সংস্রব থেকে যত দূরে থাকবে, ততই তোমার মঙ্গল হবে। বড় বড় শহরের কোনো কোনো লোক পশুবৃত্তি শান্ত করবার জন্যে রক্ষিতা রাখে, মুসলমান হলে বাড়িতে ভদ্রঘরের পত্নী রেখে বিদেশে আর একটি নিম্নশ্রেণীর মেয়েমানুষকে বিবাহ বা নেকাহ্ করে। এর মতো ঘৃণিত কাজ আর নাই। এতে নিজের মর্যাদা নষ্ট হয়, মনুষ্যত্বের ঘোর অপলাপ হয়। কামকে যথাসম্ভব চেপে রাখ। প্রথমে যোগ্য হও, তারপর ভদ্রভাবে নারীসঙ্গ আকাঙক্ষা করবেনইলে জীবনে চিরদারিদ্র্য, অফুরন্ত দুঃখ ভোগ করতে হবেই।

যৌবনকালে একটু লেখা-পড়া শিখলেই যেমন প্রথমেই কবি হতে সাধ হয়, তেমনি প্রায় যুবকেরাই ইচ্ছা হয় একেবারে কলিকাতায় যেয়ে মস্তবড় দোকানদার হই। যদি দোকানদার হবার ইচ্ছা হয় তবে যেখানেই কর, খুব ছোট হয়েই তা আরম্ভ করতে হবে। অজানা-অচেনা স্থানে মুটে মুজুর, বিড়িওয়ালা হওয়া এবং ভালো তত্রাচ ব্যবসা আরম্ভ করতে না করতে কোট-প্যান্ট পরতে যাওয়া ঠিক নয়। ও হচ্ছে পতনের লক্ষণ বরং Show-ওসবের কোনো মূল্য নেই।

যাতে হাত দেব তাতেই সোনা ফলবে। অপরেরা উন্নতি করেছে অতএব আমিও নিশ্চয় করতে পারব। এ বিশ্বাস পোষণ করাও উচিত নয়। সুদে টাকা কর্জ করে কোনো ব্যবসা করতে যাওয়াও ঘোর বোকামি। অন করের মতো অনেক খেয়ালই আমাদের মাটি হয়ে যায়। খেয়াল, হিসাবে, অনেক সময় হঠাৎ বড় মানুষ হওয়া যায়। কিন্তু কার্যত বড়লোক হওয়া দূরের কথা, দুটি পেটের অন্ন সংগ্রহ করাই অনেক সময় কঠিন।

সুদ জিনিসটা এখন সমস্ত সভ্য জগত ছেয়ে ফেলেছে। সুতরাং অযথা গোড়ামি করে সুদ খাব না বলে বসে থাকলে চলবে না। টাকা ধার দেবার ব্যবসাও সমাজে একটা মস্তবড় শক্তি। সমাজে মহাজনের আবির্ভাব হওয়া বিশেষ দরকার। মুসলমানের সমস্ত আর্থিকশক্তি, সমস্ত অর্থ-সম্পদ হিন্দু মহাজনদের হাতে দিনে দিনে কবলিত হচ্ছে। ভিক্ষুক মোল্লাদের বক্তৃতা শুনে চুপ করে বসে থাকলে আজ আর কাজ চলাবার উপায় নেই।

বড়লোক হবো, ধনী হবো, জমিদার হবো—এই আকাঙক্ষা নিয়ে যাত্রা শুরু করা ভালো নয়। এসব হচ্ছে দুরাশা, দুরাকাঙ্ক্ষা। কোনো রকমে ভদ্রতা রক্ষা করে জীবনে বেঁচে থাকবো, তার জন্যে যা হয় একটা কিছু করছি—এরূপ চিন্তা যারা মনে পোষণ করে, তারাই জগতে টিকে থাকে। এমন কি ঘটনাক্রমে তারা বড়লোকও হয়ে পড়ে।

যারা দুরাশা পোষণ করে, তারা বড়লোক তো হয়ই না, বরং জীবনে দুবেলা স্ত্রী-লোক নিয়ে তাদের দুমুঠো অন্ন সংগ্রহ করাও কঠিন হয়ে ওঠে। তাদের জীবনে কোনো শান্তি থাকে না, দৌড়াদৌড়ি করে হয়রান হওয়াই তাদের কাজ হয়ে পড়ে।

একথা ঠিক মনে রেখ—নারীই যুবকের উন্নতির পথে একমাত্র বাধা। নারীর চিন্তা মাথায় ঢুকলে তার কোনো উন্নতি কখনও হবে না।

যে কাজে দিন দিন কোনো উন্নতির আশা নেই—যা জুয়াচুরি, প্রতারণা, দুর্বলের প্রতি অত্যাচারের কাজ, এসব যুবক বয়সে করবে না, শিক্ষকতা যুবকদের সাজে না, জামিদারি সেরেস্তার কাজ ঐসবও ভালো নয়। বুড়া নিষ্কর্মা লোকের পক্ষে শিক্ষকতা মানায়। সরকারি স্কুলে যেখানে উন্নতির আশা আছে, সেখানে অবশ্য চাকরি গ্রহণ করলে অনুদিত উন্নতি হতে থাকে।

শিল্প শিক্ষা করে এবং তা ব্যবসারূপে অবলম্বন করে হিন্দু ভদ্রসন্তানেরা বেশ পরিবার প্রতিপালন করেছেন। সততা ও বিনয় জিনিস দুইটি উন্নতির মস্তবড় সহায়।

.

**১২. বাক্যের মূল্য—চটক দেখান পোশাকের বাহার**

যদি কেউ পাণ্ডিত্যে দেশকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করে, সাহিত্য প্রতিভায় নোবেল পুরস্কার পায়, ধার্মিকতায় শত সহস্র মানুষের শ্রদ্ধা-ভক্তি লাভ করে, বিজ্ঞান আলোচনায় অশেষ কৃতিত্ব লাভ করে, প্রবীণতায় আগা জারোর মতো ভক্তি ভাজন হয়, তথাপি যদি তার কথার ঠিক না থাকে, তবে সে ব্যক্তি তুচ্ছ, মূল্যহীন, অপদার্থ, তুণের মতো নগণ্য। সে কোনোমতে শ্রদ্ধার পাত্র হবার যোগ্য নয়।

বড়ই দুঃখের বিষয়–সমাজের ছেলেরা এবং প্রৌঢ়েরা ভয়ানক মিথ্যা কথা বলে, মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করে, অকারণে মিথ্যা বলে। যেন মিথ্যা কথায় কোনো দোষ নাই। যার কথার ঠিক নাই তাকে ভদ্রলোক-তো বলা চলেই না। তাকে ইতরের ইতর বলা যায়, তিনি যতই কোনো পদস্থ ব্যক্তি হউন না। ভদ্র ইউরোপীয়ানদের মধ্যে মিথ্যা কথার চলন খুব কম। কিন্তু আমাদের দেশের বিশিষ্ট লোকেরাও মিথ্যা কথা বলে এবং পত্র লেখে। কি নারী, কি পুরুষ, কি যুবক, কি যুবতী, কি বালিকা–সকলেই মিথ্যাবাদী। দায়ে পড়ে মিথ্যা বলাও সব সময় যায় না। কিন্তু বিনা কারণে, বিনা স্বার্থে যারা মিথ্যা বলে তাদের কান মলে দেওয়া উচিত। হয়তো বলবে কাল সন্ধ্যায় আসবো, কিন্তু যথাসময়ে তাকে তুমি পাবে না। লোকটা এসে তোমাকে বাড়িতেই পেলো না। একজন অধ্যাপককেও Stupid বলা যায় কারণ ঠিক সময়ে হয়তো তিনি ওজু করে নামাজ পড়বেন–কিন্তু তার কথার ঠিক নাই। বাক্যকেই মানুষ বলা যায়। কারণ বাক্যের যদি মূল্য না থাকে তবে কী করে তার উপর নির্ভর করে কাজ করা যায়।

একজন লক্ষপতি দিন-রাত্রি জপমালা হাতে করে লক্ষবার আল্লাহর বিশেষ নাম উচ্চারণ করেন, অতিশয় পীরভক্ত সেই ব্যক্তি একবার আমাকে একখানি পুস্তক লিখতে বললেন। আমি অনেক কষ্ট করে, বইখানি লিখলাম। এই লেখা শেষ হলে, একদিন বললেন–বই নেবো না। ইনি যদি সত্যবাদী হতেন তা হলে নিশ্চয়ই নিজের বাক্যের মূল্য রাখতেন।

এক Stupid রোজ প্রভাতে তার স্ত্রীকে বলতো, আজ town-এ যাব। ৮টায় ট্রেন। ৭টায়ই ভাত চাই। তার পত্নী তাড়াতাড়ি করে রোজ ৭টায় ভাত প্রস্তুত করতেন। রোজই প্রতিজ্ঞা করতেন–আজ আর যাওয়া হল না, কাল ঠিক যাবো। হয়তো জীবনভরই পত্নী এবং কত মানুষের সঙ্গে কত কাজে ইনি মিথ্যাচার করে চলেছেন, তার ইয়ত্তা কী? এই শ্রেণীর লোক জগতের কলঙ্ক এবং দাস জাতির নমুনা।

বহির্জগতের কাছে সাধু বলে পরিচিত, রোজা-নামাজের একনিষ্ঠ ভক্ত (খোদাতালা অপেক্ষা এরা রোজা-নামাজের অধিক ভক্ত) এমন লোকও মিথ্যা কথা বলতে, মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করতে লজ্জাবোধ করে না। যদি কোনো সময় কেউ তাদের ব্যবহারের সমালোচনা করে, অমনি বলবে–সংসারে অত পারা যায় না। গ্রন্থকার প্রথম জীবনে যখন সর্বপ্রথম মানুষকে সাধুতা, সততা ও সত্যনিষ্ঠার কথা বললেন–তখন পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন, অতি শ্রদ্ধাভাজন প্রবীণ আপনার জনেরা পর্যন্ত বললেন, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। সংসারের আবার সাধুতা কী? মানুষ কি অত পারে। ওসব পীর, দরবেশ, সাধু, ফকিরদের জন্যে এ তোমার ওপথ নয় বাবা! ও-পথে হাঁটলে মারা পড়বে। সত্যি করেই এই বর্বর সমাজে, এই অনুন্নত সমাজে সত্যের পথে যাত্রা করে জীবনে মরে আছি। প্রতিকূল অসংখ্য বাধাকে জয় করে সংসারে মাথা খাড়া করে রাখতে পারি নি। জীবন অসংখ্য দুঃখের ভারে নুইয়ে পড়েছে–তবুও অন্তরের সুখ এইটুকু, আপন জীবন দিয়ে সত্যের পতাকা ধরে আছি।

যুবকদের লোককে চটক দেখানোর একটা মস্ত বড় আগ্রহ জন্মে। সাইকেল, চশমা, ঘড়ি–এসব দরকারই। ভালো একটি করে কোট মাঝে মাঝে ৮/১০ টাকা খরচ করে তৈরি করা চাই। নইলে বন্ধু মহলে নাম জাগে না।

আসল কাজে মন নেই, কীভাবে দশজনের মধ্যে বড়লোক বলে বাহবা নেওয়া যায়, সেই হয় যুবকদের আগ্রহ। অসভ্যের মতো সাজ-সজ্জা করা উচিত নয়। সর্বদা চটকদার নতুন নতুন পোশাক পরে বন্ধুদের কাছে বাহবা নেওয়ার কোনো মূল্য

নেই। কোনো গতিকে কাজ চললেই হল। পোশাকে মানুষের কালো রূপ সাদা হয় না, বোচা নাক সরু হয় না, কুতকুতে চক্ষুও পটলচেরা হয় না।

জীবনের প্রকৃত মূল্যের দ্বারা জগতে বড় হওয়া যায়। চটকে, দামি পোশাকে মানুষের প্রভুত্ব ও মূল্য বাড়ে না। যা দরকার, অবস্থানুসারে তা ব্যবহার করা উচিত। অবস্থায় কুলায় না, তত্রাচ চটকদার জামার কিংবা ভালো ফারনিচারের স্বপ্ন দেখা, দিন-রাত্রি মন খারাপ করা, বড়ই হীনতা—ও-তো লোক দেখান প্রবৃত্তি মনে গোপন ভাবে বিরাজ করে। অলঙ্কার ছাড়া জগতের কোনো জিনিস দেখানোর জন্যে নয়—যারা তাই ভেবে জিনিসপত্র করে, তারা যেমন জীবনে একদিকে দুঃখ পায় অন্যদিকে তেমনি হীনতার পরিচয় দেয়। জীবনের রূঢ় আবশ্যকতার জন্যে জিনিসপত্র করতে হবে।

সাইকেল, ঘড়ি—এসব কিনবার বাতিক যুবকদের এক সময়ে চেতিয়ে তোলে—অথচ এগুলোতে প্রকৃত আবশ্যকতা ছেলেদের খুবই কম। যেখানে আবশ্যকতা, সেখানে ব্যবহার করা অবশ্যই উচিত! আসল কথা লোক দেখান প্রবৃত্তিটা বড়ই খারাপ।

.

**১৩. সাহিত্যের সঙ্গে যোগ**

যে-সকল যুবকের বাঙলা সাহিত্য অর্থাৎ দেশীয় সাহিত্যের উপর প্রভাব নেই—তাদের পরিপূর্ণ শক্তির স্ফুরণ হয় না। তাদের আত্মিক মূল্য জীবনে অনেক কমে যায়। সু-সংস্কৃতি ভাষা, সূক্ষ্ম চিন্তা আপন মাতৃভাষায় প্রকাশ করবার ক্ষমতা মুসলমান যুবকদের একটা সহজ পারিপার্শ্বিকতা, ঘটে ওঠে না, তারা ভালো করে কথা বলতে পারে না, যেন সবসময় একটা বন্ধন, একটা জড়তার ভাব প্রকাশ্য (public) জীবনে লেগেই থাকে। দেশের মাতৃভাষা, বাঙলা ভাষায়। লিখিত খবরের কাগজ, বিভিন্ন মাসিকের সঙ্গে যোগ রাখা চাই—নইলে দেশের অন্তর্নিহিত আত্মার সঙ্গে একটা গভীর যোগ, আত্মীয়তা এবং পরিচয় হয় না। যুবকদের স্বভাবে যেন সর্বদা একটা বিদেশী অনাত্মীয়ের ভাব জড়িয়ে থাকে, আপন দেশের সঙ্গে যেন তারা অপরিচিত, যেন ভুল করে ঘটনাক্রমে মুসলমান যুবকেরা, এদেশে এসে উপস্থিত হয়েছে। এই যে অস্বীকারের ভাব, এটা মুসলমান যুবকদের জন্য কত বড় ক্ষতির কথা তা বলবার নয়।

জীবন যত জটিল হয়, দেশের সাহিত্যও তত জটিল হয়। আমাদের দেশের যুবকদের জীবনে কোনো সাধনা নাই, নূতনত্ব নাই, বৈচিত্র্য নাই—শুধু, একঘেয়ে পরাধীন জীবন। বাল্যকালে লেখাপড়া শেখ, প্রৌঢ় অবস্থার চাকরি বা ব্যবসা বা কৃষি কর, বুড়াকালে বিশ্রাম কর। ধর্ম জীবনেও তাদের কোনো আন্তরিকতা নাই—একটা সাধারণ অভ্যাস পালন করে গেলেই কাজ শেষ হল। এ জীবনে আর কী বৈচিত্র্য থাকবে? নারী-পুরুষের সঙ্গে জীবনের যে একটা আত্মীয়তা, সেখানেও কোনো সাধনা বা কষ্ট করতে হয় না। যেখানে বন্ধন সেখানেই মুক্তির চেষ্টা। আমরা পরাধীন জাতি—সুখের নন্দদুলাল। সুবোধ শিষ্ট হয়ে কাজকর্ম করে যাচ্ছি। আমাদের জীবনে বন্ধন নেই—মুক্তির চেষ্টাও নেই।

লোক-সমাজে মিশতে গিয়ে বহু চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। লোক-চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হলে, যেসব সাহিত্যিক গল্প-উপন্যাসের ভিতর দিয়ে সূক্ষ্মভাবে লোক-চরিত্র অঙ্কন করতে পারেন তাদের বই পড়া উচিত। সমাজের মধ্যে মানুষের দৈনিক জীবনে যে-সব ঘটনা ঘটে, তার সুখ-দুঃখের কাহিনী, বিশ্বাসঘাতকতা, অত্যাচার, প্রতারণা, উন্নত ধর্মজীবন–এসব উপন্যাসে অঙ্কিত করা হয়। সে-সব পুস্তক পাঠ করলে মনুষ্য সমাজ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতা জন্মে। পূর্বেই বলেছি,–আমাদের সমাজে জীবনের বৈচিত্র্য নেই। বিশেষ করে মুসলমানদের জীবন যেন একেবারেই একঘেয়ে–যেন সবাই মৃত। সজীব আত্মায় চিন্তা, বিচার, পাপের সঙ্গে সগ্রাম যা মনুষ্য জীবনকে বিচিত্র করে, তা যেন মুসলমান সমাজে নেই। সুতরাং এই সমাজে ভালো কথাসাহিত্য সৃষ্টি হওয়া খুব কঠিন। তবু এ সমাজে দুঃখ ব্যথার অন্ত নাই। সমাজকে সুখময়, শান্তিপূর্ণ, সম্পদশালী, সম্মানী করার সাধনা যেদিন সমাজে জাগবে, সেদিন থেকে সমাজে ভালো সাহিত্য সৃষ্টি হওয়া শুরু হবে। এই দিক দিয়ে মুসলমানদের এক অভিনব সৃষ্টির পথ পড়ে আছে। যোগ্য ব্যক্তির হাতে পড়লে অভিনব সাহিত্য প্রভাবে সমাজে নব জীবনের সঞ্চার হবে, বিপুল কর্মসাধনা জাগবে, সমাজের জয়যাত্রা শুরু হবে। সে শুভ সময় কতদিনে আসবে, তা বলা যায় না। শিক্ষিত মাত্রেই আপন আপন সুখ-সুবিধা নিয়ে ব্যস্ত। কেউ সমাজের জন্য দুকলম লেখেন না। সাহিত্যিক হওয়া তো দূরের কথা, যারা লেখেন, তাদের প্রতি কোনো উৎসাহও নাই। বাল্যকালে কিছুদিন কোরান পড়লে, ছাত্র জীবনে পাঠ্য-পুস্তকগুলি পড়ে শেষ করতে পারলেই জীবনের শিক্ষা পূর্ণ হল। নতুন নতুন বই পড়বার আকাঙ্ক্ষা সমাজের নেই। হিন্দু সমাজের মেয়েরা যে-সব বই পড়ে, মুসলমান সম্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তিরাও ততখানি বই পড়ে না। কী উন্নতি আমাদের পক্ষে সম্ভব? আপন দেশ, মাতৃভাষা, জীবিত মনুষ্য সমাজে এবং পৃথিবীকে অস্বীকার করে চলাই আমাদের স্বভাব। আমরা যেন সবাই পরকালের মানুষ, যেন এ জগতের সঙ্গে আমাদের কোনো সংশ্রব নেই। এতেই আমাদের সর্বনাশ হচ্ছে। আমাদের বোঝা উচিত–ইহজগতের কাজের উপর পরকাল নির্ভর করে। ইহকালের। জীবনের উন্নতির উপর পরকালের উন্নতি নির্ভর করে। কবি বলেছেন–

সংসারে সংসারী সাজ;
কর নিত্য নিজ কাজ।
ভবের উন্নতি যাতে হয়।

এই বিশ্ব সংসারকে স্বীকার করতে হবে–এ বিরাট বিপুল সুখ-দুঃখের সঙ্গে মিশতে হবে। জীবিত মনুষ্য সমাজের সঙ্গে যোগ রাখতে হবে। জীবিত মনুষ্যের নতুন নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে আমরা যদি যোগ না রাখি, তা হলে আমরা দুর্বল, শক্তিহীন হবোপদে পদে লাঞ্ছিত হবো। আল্লাহর এবাদত শুধু ঘরের মধ্যে নয়–পৃথিবীর কাজের ভিতর দিয়ে তা করতে হবে। জীবিত জগৎ এবং মনুষ্য সমাজকে নিয়ে তা করতে হবে। জীবিত জাতির প্রাণের চিন্তা ও ভাবধারা সাহিত্যে ব্যক্ত হয়। সেই সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের যোগ রাখতে হবে–যদি আমরা জীবিত জাতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই। মৃতের কোনো সাধনা নাই।

কবিতা পাঠ করলে এবং সঙ্গীত শ্রবণে মন পবিত্র ভাবাপন্ন হয়, এ কারণে লোকে কবিকে সম্মান করে। অশ্লীল কবিতা–যাতে নারীর রূপ অশ্লীল ও তরলভাবে আলোচিত হয়, তা পাঠ করলে মন অপবিত্র হয়। খারাপ বই পড়লে কোনো লাভ হয় না। বিজ্ঞানের বই, উন্নত কবিতা, কাব্য, ভালো উপন্যাস, জীবনী, ইতিহাস, উন্নত চিন্তা, এসব নিত্য পাঠ করলে মানুষের প্রভূত কল্যাণ হয়–দিন দিন মানুষ উন্নত হয়। যে সমস্ত যুবকের সৎ সাহিত্যের সঙ্গে সংস্রব নেই, যারা অনুন্নত নিম্ন সমাজে সদা

মেশে, কথা বলে, আলাপ করে, ভদ্রসমাজে ওঠা-বসা করে না–তাদের রুচি, চরিত্র, ব্যবহার দিন দিন জঘন্য ও কদর্য হতে থাকে। অহঙ্কার, অশিক্ষা, মন্দভাব, সংকীর্ণতা তাদের জীবন ও মনকে অজ্ঞাতসারে দুর্গন্ধময় করে, যা তারা নিজেরা বুঝতে পারে না।

.

**১৪. যুবকদের বাহুল্য খরচ**

অভিভাবকহীন যুবকেরা যে কত রকমে বাহুল্য খরচ করে তার ইয়ত্তা নেই। কলেজে পড়ার সময় যুবকদের মনে বুড়া বাপ-মা'র জন্যে কিছুমাত্র মমতাবোধ থাকে না। কেবল টাকার জন্য চিঠি বাড়ি আসে। কত অজুহাত–যেমন নতুন বই কোনো, কলেজের মাইনে, ঔষুধ খরচ ইত্যাদি দিয়ে নানা ভাবে বুড়া বাপের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হয়। পড়ার বেলা হয়তো গল্পসল্প করেই সময় কাটে। পোশাক এবং ইয়াকী করতে ষোল আনা, যুবকদের পিতৃনিন্দাও মুখে লেগে থাকে। এত যে টাকা দেওয়া হয়, তবু ছেলের মন পাবার জো নেই। এইসব হতভাগা কাণ্ডজ্ঞান হীন ছেলের লেখাপড়া হবার আশা খুব কম। তবু বুড়া বাপ-মা আশা ও আনন্দে এদের পেছনে অজস্র টাকা ব্যয় করতে থাকেন।

শাসন করেও কোনো ভালো নেই–সেয়ানা যুবক ছেলেকে শাসন করে পড়তে বাধ্য করা যায় না। এত দৌড়াত্ম করেও যদি পরীক্ষায় পাস করতে পারে, তা হলে মনকে সান্ত্বনা দেওয়া যায়।

যুবকদের মনে করা উচিত, সংসারে টাকা-পয়সা সংগ্রহ করা বড় কঠিন। বাবা বিশেষ হিসাবী বলে টাকা দিতে পারছেন। নিজের শত অভাব ঠেলে ফেলে ছেলের অভাবের কথাই আগে ভাবেন–যদি যুবক ছেলে বাপের হৃদয় বেদনা একটুখানি বুঝতো, তা হলে নিশ্চয় সে সুবোধ হতো। পড়া-লেখাও মন দিয়ে করতো। যথা সময়ে পাস করে দেশের ও দশের প্রশংসাসহ বাড়ি ফিরে আসতো, সংসারে সুখে থাকতে পারত।

বাপ-মাকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে, নানা প্রকার বাহুল্য খরচ করে, থিয়েটার-বায়োস্কাপ দেখে, পোশাক-পরিচ্ছদ করে, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ফুর্তি করে ছেলে পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি আসে, শেষকালে দেখা যায়, ছেলে ফেল ডিভিসনে পাস করেছে। বাড়ির কাছে যদি কোনো মাইনর স্কুল থাকে, তবে ছেলে সেখানে যেয়ে অবৈতনিক শিক্ষক হয়। টাকার দংশন বেদনা সহ্য করা বড়ই কঠিন কার্য। হাতে টাকা থাকলে যত বেলা তা খরচ করে নিঃসম্বল এবং রিক্ত হস্ত না হওয়া যায়, তাবৎ যেন আর শান্তি থাকে না। বুদ্ধিহীন যুবকদের হাতে টাকা পড়লে তা যে অতি অল্প সময়ে নিঃশেষিত হবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সংসারে যদি কোনো নগদ টাকা থাকে তবে তা খুব গোপনে কোনো প্রবীণের হেফাজতে রাখা উচিত, নইলে সে টাকা কিছুতেই থাকবে না। পিতার মৃত্যুর সঙ্গে যুবকেরা হাতে টাকা পেয়ে দুই হাত দিয়ে বাহুল্যভাবে খরচ করতে থাকবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা কেউ বোঝে না। যতদিন টাকা থাকে, ততদিন যুবকেরা তার মূল্য বুঝে না।

যে টাকার উষ্ণতা সহ্য করতে পারে, কৃপণের মতো খরচ না করে টাকা বুকের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে–সে জীবনে সুখে থাকে। জীবনে তার দুঃখ হয় না। সঞ্চয়ের বুদ্ধি সকলের থাকে না অধিকাংশ যুবকই বাহুল্য খরচে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে।

নগদ টাকা বহু সম্পত্তি ছেলেদের না দিয়ে কোনো সৎ প্রতিষ্ঠানে দান করে যাওয়া ভালো। ছেলেরা যাতে ভদ্রলোকের মতো চলে, তার শি দিলে তাদের অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। প্রথম জীবনে মনুষ্য নিতান্তই অপরিপক্ক বুদ্ধি ও ছেলেমানুষ থাকে! আঘাত, অভাব, বেদনা ছাড়া মানুষ কখনও শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় না।

মানুষ কেউ কাউকে সুখী ভালো ও বড় করতে পারে না। আপন যোগ্যতায় মানুষ যোগ্যস্থান ঠিক করে নেয় উচ্চাসন দিলেও, সে আসনের মর্যাদা ঠিক রাখতে পারে না। এ কারণে ছেলেদের যতটুকু দরকার তার এক ক্রান্তি বেশি দিয়ে তাদের সর্বনাশ করা উচিত নয়। মানব কল্যাণের জন্য উন্নতপ্রতিষ্ঠানে জীবনের সঞ্চিত ধন ব্যয় করা, যথার্থ জ্ঞানীর কার্য–ছেলে-পেলেকে দেওয়া মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের কী এমন দাবি আছে। পিতার উপর, যাতে করে তারা পিতার সমস্ত ধনরত্ন নিজেরাই অধিকার করবে? সন্তানেরা বছরেও হয়তো পিতার কথা একবার মনে করবে না–পোতা ছেলেরা তো জীবনেও। একবার করবে না। ছেলেদের শিক্ষাকালে তাদের ন্যায্য খরচ দিতে কৃপণতা করা উচিত নয়। অবশ্য সে কথা পুত্রদের বলা উচিত নয়।

বড়ই দুঃখের বিষয়, অনেক লোক যুবকদেরকে তাদের পিতার নিন্দা করে তাদেরকে পিতৃদ্রোহী করতে চেষ্টা করেন। পিতার কার্যে কোনোরূপ ভুল ধরা পুত্রের পক্ষে অনুচিত। পিতা যে সাহায্য করতে পারেন, তাতেই সন্তুষ্ট থেকে জীবন পথে অগ্রসর হবে। পিতার কোনো কার্যের সমালোচনা করা মহাপাপ। পিতার অমতে কোনো ধর্মকার্য, কোনো সন্ধার্য সিদ্ধ হয় না–তার ইচ্ছা পালন করাই সুবোধ পুত্রের কাজ। যা মহাপাপ তা করবে না, করলেও সে পাপ পুত্রের হবে না, পিতারই হবে। বিদেশে যুবকদের চরিত্র খারাপ হতে পারে। এর ঔষধ পুত্রকে সদুপদেশ দেওয়া, সস্নেহ ব্যবহার করা। যুবক বয়সে ছেলেদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করলে, তাদের চরিত্র খারাপ হবার খুবই সম্ভাবনা।

যুবকেরা যদি বেশ্যালয়ে গমন আরম্ভ করে, সমাজে মিশে সুরাপান অভ্যাস করে তা হলে তো সে বাহুল্য খরচ করতে শিখবেই। যুবকদের এ অভ্যাস হলে তো সর্বনাশের পথ রচিত হবেই। যদি তাই হয়, তবে লেখাপড়া বাদ দিয়ে বাড়ি এনে সাংসারিক কাজের ভার দেওয়াই ভালো।

যার ভিতর একবার এ পাপ প্রবেশ করেছে তাকে মরণ গহ্বরে টেনে না নিয়ে আর এ পাপ তাকে ত্যাগ করে না। এই সময় কোনো উচ্চস্তরের বন্ধুর চরিত্র প্রভাব এবং সহবাসই তার পক্ষে উত্তম ঔষধ। এ সম্বন্ধে প্রকাশ্যে বকাবকি করাও উচিত নয়–তাতে লজ্জা ভেঙ্গে যায়, ফল খারাপ হয়।

থিয়েটারে যাওয়া, ছায়াচিত্র দেখা, Style বজায় রাখা, এইসব ব্যাপারেই যুবকেরা বাহুল্য খরচ করে।

.

**১৫. যুবকের মুখে অশ্লীল ভাষা**

কোনো কোনো যুবক এত ইতর (Vulgar) যে তারা কথায় কথায় অতি অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করে। অতি মাত্রায় মূঢ় ও হীন না হলে যুবক কখনও ইতর হতে পারে না। বলতে কী এই শ্রেণীর যুবককে সমাজ থেকে বের করে দেওয়া উচিত, তবে সবাই যদি নীচ ও ইতর হয় তবে আর কে কাকে বের করে?

যুবকদের মনে করা উচিত, মনুষ্য এমন কি লম্পট, বেশ্যা পর্যন্ত যা দেখাতে লজ্জা বোধ করে,–তা প্রকাশ্যভাবে এক প্রকার মুক্ত করেই দেখানো কতখানি ভালো কাজ! নিতান্ত পশু না হলে কে কাকে উলঙ্গ করতে চায় এবং উলঙ্গ হতে চায়? নীচ শ্রেণীর যুবকেরা কথায়, ভাষায়, ব্যবহারে যেন সর্বদাই মানব সমাজে উলঙ্গ হয়ে তাদের কুৎসিত, উলঙ্গ বীভৎস মূর্তি দেখাতে চায়! ধিক! এইসব নরপিশাচ যুবকদেরকে, যারা অশ্লীল কথা বলতে লজ্জাবোধ করে না, যারা বৃথাই বস্ত্র পরিধান করে। ধিক! এদের পিতামাতাকে–এদের আত্মীয়-স্বজন ভ্রাতা-ভগ্নিকে!

এরূপ ছেলেকে সংসারের এবং সমাজের সকলেরই ঘৃণা করা উচিত। খোদা যা গোপন করতে বলেছেন, তা কথায় প্রকাশ করা ঘোর অধর্ম। যুবকেরা ধর্মের কোনো ধার ধারে না–তাদের মনে খোদার ভয় এক প্রকার নাই বল্লেই চলে।

সমাজের যে-সব লোক ইতর শ্রেণীর অন্তর্গত, তাদেরকেই অশ্লীল কথা বলতে শোনা যায়। তারা সাধারণত অশিক্ষিত অমার্জিত রুচির। তাই বলে শিক্ষিত ঘরে বা ভদ্রঘরের ছেলে বলে যদি কেউ দাবি করে, তারা যদি ইতরের মতো অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে, কথায় কথায় যেখানে সেখানে পাড়া-প্রতিবেশীর বাড়ির ভিতরে, গুরুজনের সম্মুখে কুভাষা ব্যবহার করে, তবে সে বড়ই ঘৃণার কথা। সমাজের কেউ যদি জোর করে অন্যায় করতে থাকে, অন্যায় পথে চলে তবে প্রথমে তাকে সাবধান করে, তার সংশ্রব ত্যাগ করাই ভালো।

কোনো কোনো জননী বলে থাকেন–শিশুদের কুস্বভাব বড় হলে সেরে যাবে। কিন্তু সব সময় তা হয় না। বাল্যকালে অত্যধিক প্রশ্রয় পাওয়াতেই ছেলেদের স্বভাব মন্দ হতে থাকে, ততই তারা বেশি করে মন্দতায় দৃঢ় হতে থাকে–জীবনে আর সংশোধন হয় না।

খালি গোয়াল ভালো, তবু দুষ্ট এড়ে ভালো নয়। সংসারে যদি একটি ছেলে দুষ্ট, ইতর, অশ্লীল ভাষাসক্ত হয়ে ওঠে তবে তার দেখাদেখি বাড়ির সব ছেলে খারাপ হয়। পাড়া গাঁয়ের লোকদের মাঝে, সৎ কথার আলোচনা এক প্রকার নেই বললেই হয়। কোনো লোকের কোনো মন্দ ব্যবহার বা মন্দ স্বভাব দেখলে তাতে ঘৃণা প্রকাশ না করে, লোকে বরং উৎসাহই প্রদান করে–কারণ সকল মানুষই মন্দ! মন্দতায় কে কাকে কতখানি ছাড়িয়ে যেতে পারে, তাই যেন হয় সবার প্রতিযোগিতার বিষয়।

একটা ছেলে, একটা যুবক, একটা মানুষ, একটি বালিকা যখন ধ্বংসের পথে যেতে থাকে, তখন তার জন্য প্রত্যেক জ্ঞানবান মানুষের মনে কঠিন দুঃখ উপস্থিত হয়। শরীরের ধ্বংস অপেক্ষা আত্মিক ধ্বংসই অধিকতর আক্ষেপের বিষয়। হায়, মনুষ্য যেন বিনাশের জন্যই প্রস্তুত! জীবন যে চারু না!

**১৬. যুবকদের ধর্মজীবন**

যুবকদের ধর্মজীবন বলে কিছু নেই। যখন যৌবনের উত্তেজনা তার শিরায় শিরায় নৃত্য করে, তখন উচ্ছৃঙ্খলতা, সৎ নিয়মের অবমাননাই হয় তার জীবনের শ্রেষ্ঠ বিষয়। যে। যৌবন ঈশ্বরের আরাধনায় নিবেদিত হল না, বৃথাই সে যৌবন। যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর সাধনা–তার শ্রেষ্ঠ সময়ই যৌবনকাল। এই সময় যদি কদর্য শয়তানী প্রভাবে আত্মা অধঃপতিত হয়, তবে আর সে জীবনের উদ্ধারের আশা নেই। যৌবনের রক্তই আল্লাহ্ চান। আল্লাহর পূজা জানে, না করতে পারে?

সমস্ত রিপুকে দমন করে, যৌবনের তাবৎ সৌন্দর্য প্রভুর পাদপদ্মে নিবেদন কর। কে কবে ছিন্ন কুসুম দিয়ে দেবতার পূজা করে? যে জীবন দুর্বল, বার্ধক্যভারগ্রস্ত, জরাজীর্ণ, বলহীন সে জীবন কি আল্লাহর আরাধনার যোগ্য? তপস্যার প্রকৃষ্ট সময়ই যৌবন–হায়, এই যৌবনকালে যে প্রভুর এবাদত ত্যাগ করে বিফলে কাটিয়ে দিল–আক্ষেপ তার জন্যে!

বুড়াকালে আপনাআপনি খোদার নাম পড়বে। বুড়াকালে বেশ্যাও ধার্মিক হয়। যদি যৌবনে আল্লাহর ফকির হতে পার, সেই হয় শ্লাঘার বিষয়।

মহিলা ঋষি রাবেয়া তার যৌবনই নিবেদন করেছিলেন আল্লাহর পায়ে। যৌবনেই তার ফকিরি হাসেল হয়েছিল, তার নির্মল শুভ্র, প্রেমময় আত্মার ভক্তি বাণীর তুলনা কোথায়? যৌবনের অমন মহৎ আত্মোৎসর্গ কোথায় দেখা যায়? কী সুন্দর! কী সুন্দর! তিনি আজীবন অবিবাহিতা ছিলেন। যে প্রেমের স্বাদ পেয়েছে বিবাহ সংসার বন্ধন কি তার আর ভালো লাগে? সংসার কী?–এ কেবল ভস্ম মাটি আর আবর্জনা। যুবকেরা একেই পরম উপাদেয়, পরম সুন্দর পদার্থ বলে জানে। যার চোখের ঘুম ভেঙ্গেছে–সেই বুঝেছে, প্রভু কী?–সংসার কী?

কি নিয়ে মানুষ ডুবে থাকে সংসারে? সংসারের কি দেখে ছেলেরা সংসারের জন্যে এতো পাগল হয়। প্রভুর মহিমাময় প্রেমময় আহ্বান নিত্য যৌবনের কাছে থাকে, সে তা উপেক্ষা করে ছোটে বিপরীত দিকে কীসের লোভে, কিসের মায়ায়, কিসের আকর্ষণে?

একটি যুবক একদিন বলেছিল, নারীই অমর ঈশ্বর! পাঁচ বছর পরে তার ভিতর আর সে ভক্তি দেখা গেল না। কোথায় গেল তার মাদকতা, এত আকর্ষণ নারীর জন্যে?

নিত্য মারামারি, কলহ, শৃগাল-কুকুরের মতো কাড়াকাড়ি দ্বেষ-হিংসা, ঘৃণিত সাংসারিক বিষয়ে প্রতিযোগিতা, আড়াআড়ি, অর্থলোভ, স্বার্থপরতা, সম্পত্তি, অট্টালিকা এই-ই কি মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণের বস্তু? কয়দিন এগুলি ভোগ করতে পারবে? শেষকালে কোথায় যাবে?

.

**১৭. জীবনে ফকরামি ও চালবাজী**

দুই একটি যুবক এত ধাপ্পাবাজ, মিথ্যাবাদী, তা আর বলা যায় না। এসব ধাপ্পাবাজী করে তাদের লাভ হয় না, তবু তারাও না করে পারে না। নিজের একটুখানি সুবিধার জন্যে, শত মিথ্যা বলতে একটু লজ্জা এদের নেই।

কোনো কোনো যুবক শঠামিতে বেশি বিশ্বাসী। সত্যে কিছু মাত্র শ্রদ্ধাশীল নয়। মিথ্যা বলতে একটুও লজ্জা নেই। সর্বদা নিজের লাভের লোভে জোড়াতালি দিয়ে, অসরলভাবে কথা বলে। কথায় এদের বিন্দুমাত্র সরলতা নেই।

বিপদে পড়লে এরা কুকুরের মতো নত হয়। একটু শক্তি লাভ করলে পুনরায় আপন শঠতাপূর্ণ পথ গ্রহণ করে। দয়া, মনুষ্যত্ব, ত্যাগস্বীকার, পরোপকার–এদের কাছে স্বপ্ন, জীবনের খেয়াল মাত্র। এরা কখনও ধর্ম কথা শুনতে চায় না–ওসব বিশ্বাসও করে না। এদের ভয়াবহ জীবনের স্পর্শে যারা আসে তারাই বিপদে পড়ে।

এরা বেশ মিষ্টি কথা বলে–এদের মন্দ বলে ধরবার কোনো উপায় নেই। শুধু একটু ব্যবহার করলেই বোঝা যায়–এদের প্রকৃতি। এদের বিষ কোথায় লুকানো থাকে, তা প্রথমাবস্থায় মোটেই বুঝতে পারা যায় না। শেষকালে এদের পতন অপরিহার্য। আপন জালে আপনি আবদ্ধ হয়ে এরা শোচনীয় দুর্গতি লাভ করে। সত্য ও ধর্ম পথই একমাত্র। মানুষের জীবন ও কল্যাণের পথ। সত্যপন্থী হেরেও শেষ কালে জয়ী হয়।

.

**১৮. প্রভু ভৃত্য**

আজকাল দেখা যায় যুবকেরা প্রভুর অধীন কার্য করে প্রভুর অন্নে প্রতিপালিত হয়; কিন্তু মনে মনে প্রভুর প্রতি ষোল আনা অকৃতজ্ঞ থাকে। যিনি অন্ন দিয়ে পালন করেন, তিনি পিতার তুল্য। তার নিকট কৃতজ্ঞ থাকা সর্বতোভাবে কর্তব্য।

প্রভুকে অমান্য করা, তার নিন্দা করা, তার কার্য ষোলআনা না করা, ভৃত্যের উচিত নহে। প্রভুর মঙ্গল সর্ব প্রকারে অন্বেষণ কর–তাই প্রকৃত ধার্মিক ভুত্যের কাজ।

কোনো কোনো যুবক বলেন, অপরের দাসত্ব করা আমার পক্ষে শোভা পায় না। এ উদ্ধত শয়তানের ভাব ছাড়া কিছু নহে। অতি শ্রেষ্ঠ লোককেও সময় অবস্থাচক্রে কারও দাস হতে হয়, তাতে লজ্জার কিছু নেই। আলস্য করে জীবন নষ্ট করা পাপ। হয় নিজের কাজ, না হয় পরের কাজ কর। শক্তি ও জীবন ব্যর্থ কর না। সেবা ও দাসত্ব ছাড়া জগৎ চলে না। যতক্ষণ অপরের দাসত্ব কর, ততক্ষণ প্রভুর কাছে অহঙ্কারের পরিচয় দিও না। প্রভুর কাছে সর্ব প্রকারে নত হও–তুমি যতই পণ্ডিত ও শ্রেষ্ঠ হও যার কাছে দাসত্ব স্বীকার করেছ, তিনি মূর্খ ও ছোট হলেও তোমার প্রভু তিনি। প্রভুর মঙ্গল কামনা করাই ভৃত্যের ধর্ম। কারও সেবা করায় মানুষের অপমান হয় না, যদি পরিপূর্ণ সেবা দ্বারা প্রভুর সন্তুষ্টি সাধন করতে পার তাতেই মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্ব প্রকাশ পাবে। প্রভু হয়েও মানুষ মনুষ্যত্বে এবং কর্তব্য পালনে আপন ভৃত্যের কাছে ছোট হতে পারেন। ছোট ও বড় হও,–যিনি জীবনে আপন কর্তব্য পূর্ণভাবে পালন করতে পারেন, তিনিই মহৎ। রেলের একজন কুলিও মহৎ ব্যক্তি হতে পারে। একজন ডেপুটির আদালিও মনুষ্যত্বে ডেপুটির চাইতে শ্রেষ্ঠ হতে পারে। যে নমস্কার পায়, সেই শ্রেষ্ঠতা বলা যায় না। যে নত হয়ে প্রভুকে নমস্কার করে সেই মনুষ্যত্বে হয়তো প্রভু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

যে জীবনে আপন কর্তব্য পূর্ণভাবে করতে পারে সেই বড়। যে বিশ্বাস-ঘাতক, আলস্যপরায়ণ, উচ্চাসনে বসে থাকলেও সে ছোট।

নমস্কার করতে কখনও লজ্জাবোধ করো না। নমস্কার করলে মানুষ ছোট হয় না সে বড়ও হতে পারে। প্রভুর কাছে যত ছোট ও নত হও ততই ভালো। প্রভুকে যত প্রকার সেবা করতে পার, কর। আজকাল অকৃতজ্ঞতা, অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যের যুগ পড়েছে। মন্দতায় মানুষ উৎসাহশীল, মন্দতায় মানুষ মানুষকে প্রশংসা করে। মানুষ যেন একেবারে ধর্মহীন হয়েছে। অধর্মের যুগ পড়েছে। তাই মানুষও মানুষকে প্রেম করে না। আজ পুত্র পিতার কাছে নত হয় না, প্রজা রাজাকে শ্রদ্ধা করে না, স্ত্রী স্বামীকে অপদস্ত করে, ভৃত্য প্রভুকে মান্য করে না। ফলে মানুষের যথার্থ উন্নতি হয় না। প্রত্যেকে প্রত্যেককে অবিশ্বাস করে–ফলে কাউকে কেউ ভালোবাসে না। শিক্ষা মানুষকে যেন পশু করেছে। যেন চড়াছড়ি, মারামারি, খুনোখুনি দ্বারাই জগৎ চলবে। প্রেম, সেবা, মনুষ্যত্ব, দয়া, ভালোবাসার প্রভাব যেন মানব সমাজে আর নেই। রাস্তার ভিক্ষুক রাস্তাতেই মরতে থাকবে। এই হচ্ছে এখনকার মানুষের কথা। কেউ কারো দিকে তাকাবে না।

কিন্তু এটি ঠিক পথ নয়। যা শয়তানি ভাব তা কখনও শান্তির পথ নয়। জগতে একটি সাংঘাতিক উলট পালট আসবে, তারপর মানুষ এক নূতন ধর্মের সন্ধান পাবে। সহজে মানুষের চৈতন্য হয় না।

.

## ১৯. Honourable ব্যবহার

যে ব্যবহার গলদশূন্য তাকেই Honourable ব্যবহার বলে। দোষশূন্য মহৎ ব্যবহার ভদ্রলোকের জীবনের ভূষণ। জনৈক পুলিশ ইনস্পেক্টর জীবন ভরে একটি নির্দোষ ব্যক্তিকে ক্রোধের বসে দুঃখ দিয়াছিলেন, শেষকালে একদিন অতিশয় বিপন্ন হয়ে এই ব্যক্তির হাতে পড়েন। ভদ্রলোক ইচ্ছা করলে পুলিশ কর্মচারীকে যারপরনাই অপদস্থ করতে পারতেন। কিন্তু সে কথা একবর্ণও না তুলে তিনি তাকে অতিশয় সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করলেন, তাকে আহার করালেন, তার জীবন রক্ষা করলেন। এবং যথাসময়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিলেন। পরের দিনই কর্মচারী কর্মত্যাগ করে তার জীবনব্যাপী পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলেন। সেই ভদ্রলোকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, বালকের মতো তার সম্মুখে অশ্রু বিসর্জন করলেন।

যা উন্নত, মহৎ, দোষশূন্য ব্যবহার–তার সম্মুখে অতি দূরাচার ব্যক্তিও লজ্জায় মাথা নত করে। উন্নত মহৎ ব্যবহার সর্বদা ক্ষমাশীল প্রতিহিংসা বর্জিত, এবং পিতার স্নেহের মতো গভীর, সহিষ্ণু এবং ...। বিবাহের রাত্রে এক যুবক অন্যায় করে এক যুবতী নারীকে অসতী বলে বিবাহ ভেঙ্গে দিলেন। বিবাহ মজলিস ভেঙ্গে গেল। এ জীবনে আর তার বিবাহ হল না। একবার এই যুবকের নিউমোনিয়া হল। এই যুবতী নারী যুবকের বিছানা পার্শ্বে তিন মাস বসে থেকে, তার সেবা করে তাকে রোগ মুক্ত করলেন। ভালো হয়ে যুবক চেয়ে দেখলেন, যে নারী–জীবনকে তিনি অন্ধকার করে দিয়েছেন, সেই তাকে বাঁচিয়েছে। যুবক মা বলে প্রৌঢ়ার (এখন তিনি প্রৌঢ়া) পা ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। নারী বল্লেন–আমি সেকথা ভুলে গেছি ভাই, অনেক দিন।

এক পীড়িত ভ্রাতাকে তার দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা সর্বস্ব বঞ্চিত করেছিলো। পীড়াকালের অনেক সময় অনেকদিন পীড়িত ভ্রাতার পরিবারবর্গ উপবাস করে থাকতেন, দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বচ্ছল অবস্থায় থেকে সে দিকে ফিরেও তাকাতো না। ভ্রাতা যখন সুস্থ হয়ে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হলেন, সেই সময় দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতার দুর্গতির সীমা রইল না, তখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উভয় ভ্রাতার

ছেলেমেয়েদের ভার গ্রহণ করলেন। গত জীবনের কথা একটিবারও উচ্চারণ করলেন না। এরই নাম নিষ্কলঙ্ক, দোষশূন্য, মহৎ ব্যবহার–যা রাজার মুকুটের মতো গৌরবের ভূষণ।

কোনো এক জমিদার মৃত্যুকালে তার দ্বিতীয় পত্নীর প্ররোচনায় পূর্ব স্বামী-জাত ও প্রবাসী তার পুত্রকে সমস্ত সম্পত্তি দান করে যান। তার মৃত্যুর পর তাঁর প্রথমা পত্নীর জ্যেষ্ঠ পুত্র কিছু সন্দেহ না করে পিতার বিশাল সম্পত্তি যেন উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে থেকে পিতার সম্পত্তি চালাতে লাগলেন! তিন বৎসর পরে হঠাৎ বিমাতার পুত্র এসে বললো–এ সম্পত্তিতে আপনার কোনো অধিকার নেই। ভদ্রলোক কোনো প্রকার রোষ প্রকাশ না করে। তৎক্ষণাৎ হাসিমুখে জমিদারি ত্যাগ করে দরিদ্রের জীবন যাপন করতে লাগলেন। বিমাতার। পুত্র কিছুমাত্র বিবেচনা করলেন না। সে জন্য তিনি কোনো দিন অনুযোগ করেন না।

বহু বছর পর হঠাৎ বিমাতার পুত্র এই যুবক মারা গেলেন। তার ছোট যিনি তিনিও সুন্দরবনে ব্যাগ্র শিকার করতে যেয়ে মারা গেলেন। তখন বাধ্য হয়ে পিতার প্রথম জ্যেষষ্ঠপুত্র আবার স্ব-সম্পত্তির গদিতে বসলেন। সুখ-দুঃখে, সৌজন্যে দারিদ্র্যে তাঁর সমান ভাব। মুখে অহঙ্কার, আস্ফালন, দারিদ্র-দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস, অনুযোগ, মারামারি, কুৎসা রটনা কিছুই নেই। এরাই honourable motive-এর লোক।

.

**২০. যুবকদের পড়াশুনা**

সারা বৎসর বসে থেকে পরীক্ষার পূর্বে চোখে অন্ধকার দেখা, কোনো কোনো সময় পড়া ছেড়ে দেওয়া, পালিয়ে যাওয়া, আত্মহত্যা করা কোনো কোনো যুবকের স্বভাব। যুবক, হতাশ হয়ো না! বিশ্বাস করো, সহিষ্ণু হয়ে পড়তে শুরু করো। পাহাড় বলে যা মনে হচ্ছে তা মিষ্টি হালুয়া বলে মনে হবে। যা ভুল হয়েছে, তা হয়েছে–যে সময়ই থাক সহিষ্ণু হয়ে। পড়া শুরু কর–দেখতে পাবে কয়েকদিনেই অনেকটা এগিয়ে গেছ। বসে বসে ভাবলে, কিছু লাভ হবে না–ওতে যা পারতে তাও পারবে না। যে তোমার চাইতে ভালো জানে, সে আপন সহপাঠী হলেও অহঙ্কার ত্যাগ করে, তার কাছে বুঝে নাও তাতে কোনো লজ্জা নেই। অহঙ্কার করলেই ঠকবে। যে বেশি জানে, তার কাছে যেয়ে নত হয়ে পড়াশুনা নেওয়া খুব ভালো। মেধাবী ছেলে শিক্ষকের মতো সহপাঠীকে পড়িয়ে দিতে পারে। অহঙ্কার করে আজ তার কাছে যাচ্ছ না, কাল সে তোমাকে ছেড়ে উচ্চ শ্রেণীতে চলে যাবে। তুমি প্রকাশ্যভাবে যেখানে আছ সেখানেই পড়ে থেকে অর্থ সম্মান দুই হারাবে।

অনেক যুবক ভাবে, আমি খুব জানি। এই ধারণাও সর্বনাশের মূল। কুকুর বেশি দৌড়াতে পারলেও অনেক সময় কচ্ছপের কাছে হেরে যায়।

বৎসরের প্রথম থেকেই প্রত্যেক দিনকার পড়া প্রত্যেকদিন করবে-কখনও আলস্য করে ফেলে রেখো না। তাতে মাথায় পাহাড় চাপবে। একদা হযরত মুছা আদিষ্ট হলেন, কাল প্রাতে প্রথমেই মাঠে যা দেখতে পাবে তাই আহার করবে। প্রাতঃকালে মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখলেন–একটা বিরাট পাহাড়। পাহাড় দেখে মুছা ভীত হলেন, কিন্তু খোদার আদেশ অমান্য করা চলে না, তিনি অগ্রসর হতে লাগলেন। যতই নিকটবর্তী হতে লাগলেন। ততই বৃহৎদর্শন পাহাড় ছোট হতে লাগলো। নিকটে যেয়ে দেখলেন–পাহাড় নয়, এক টুকরা হালুয়া। পরম আনন্দে মুখে ফেলে দিয়ে সুস্বাদু হালুয়াটুকু খেয়ে ফেল্লেন।–এর।

শিক্ষা হচ্ছে দূর থেকে কাজকে কঠিন বলে মনে হয়–চেষ্টা করলে কাজ অতি সহজ হয়ে ওঠে। কাজ দেখে কখনও ভয় পেয়ো না–একটু একটু করে চেষ্টা কর।

যেসব যুবক অনর্থ অত্যধিক শুক্র ব্যয় করে, তারা পাঠে মন সংযোগ করতে পারে। পড়াও তাদের হয় না। অতএব ছাত্রাবস্থায় ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করবে, মন্দ সংস্পর্শ ত্যাগ করবে। মন্দ গান, মন্দ পুস্তক, অশ্লীল আলাপ, নারী সংশ্রব ত্যাগ করবে। নইলে কখনও লেখাপড়া হবে না।

**২১. যুবকদের স্বাস্থ্য ক্ষয়**

যুবকেরা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সোনার শরীর ধ্বংস করে ফেলে। ও! কি যে সর্বনাশ করে, তা আর বলবার নয়। অস্বাভাবিকভাবে শুক্র ক্ষয় করে নিজের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ফেলে। সেই ভগ্ন শরীরে বিবাহ করে দীর্ঘদিন অত্যাচার করে একেবারে মুষড়ে পড়ে। বড়লোক হলে অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেগ সামলে নিতে পারে। গরিব লোক হলে সে বিবিধ রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে প্রাণ হারায়। অত্যধিক শুক্র ক্ষয়ের ফল–পুরুষত্ব হীনতা, মেহ; প্রমেহ, জ্বর, কাশি, হাঁপানী, অজীর্ণ, শিঃরপীড়া, যক্ষ্মা, আলস্য এবং আরও বড় ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়।

যারা শুক্র রক্ষা করে তারা জীবনে অক্ষয় স্বর্গসুখ ভোগ করে। জীবনে তাদের আনন্দের সীমা থাকে না। এহেন রাজ সুখ বর্জন করে যারা সাময়িক সুখের আশায়–অযথা শুক্র নষ্ট করে জীবনে অসীম দুঃখের অন্ত থাকে না। ছাত্রাবস্থায় ব্রহ্মচর্য পালন শ্রেষ্ঠ ধর্ম। শুক্র রক্ষা ছাড়া যুবকের ইহকালে কোনো কল্যাণ সম্ভব নয়।

.

**২২. অসমান প্রেম**

হুগলীতে একটি মাদ্রাসায় পাঠরত সুন্দরদর্শন যুবক ছেলে স্থানীয় এক হোটেলওয়ালীর সেয়ানা যুবতী মেয়েকে বাড়িতে না জানিয়ে বিয়ে করে ফেলবেন। হয়তো মাঝে মাঝে হোটেলে দেখতে যেতেন, সেই অবকাশে মৌলবী সাহেব মেয়েটিকে দেখেছিলেন। হোটেলওয়ালী মৌলবী ছাত্রটিকে অবশ্য কিছু সম্মানের চোখে দেখতো। যাই হোক শেষকালে মৌলবী সাহেব বিদেশে এই কাজ করে বসলেন। এর ফল ভালো হল না। অতি অল্পকালের মধ্যে পরস্পরের মনোমালিন্য শুরু হল। সামান্য রকম নয়–খুব বেশি রকম। মৌলবী সাহেব শাশুড়ীর গৃহত্যাগ করে স্বতন্ত্র স্থানে জায়গীর করলেন সেখানে ভদ্রলোকের মাঝে প্রায়ই সেই ইতর শ্রেণীর প্রৌঢ়া মেয়েলোকটি জামাইকে প্রকাশ্যভাবে গালি দিয়ে যেতো। এক বিপুল লজ্জাজনক ব্যাপার। যুবকটির মুখ লজ্জা, দুঃখে কালি হয়ে যেতো–কিন্তু আর কোনো উপায় ছিল না।

যাই হোক অসমান মিত্রতা বড় খারাপ। ছোট, বড় প্রেম, একেবারেই আপত্তিজনক। ছোটর উচিত নয় বড়'র সঙ্গে মেলামেশা, ভালোবাসা করে–তাতে তার নানা প্রকার বিপদ এবং ক্ষতি হবে। বড়'র সঙ্গে মেলবার এক উকট প্রবৃত্তি ছোটদের সব সময় থাকে, এটি বড় খারাপ, বড় খারাপ ছোট, বড় প্রেম একেবারেই আপত্তিজনক। সময়ে বড় লোকের সংশ্রব থেকে দূরে সরে আসবে।

.

## ২৩. জাতীয় বৈশিষ্ট্য

নিজের জাতীয় রীতি সর্বোৎকৃষ্ট সংস্কারের দরকার হলে স্থানবিশেষ সংস্কৃত করতে হবে। এরূপ ধারণা প্রত্যেকের থাকা উচিত। পোশাক-পরিচ্ছদ আপন জাতির মতো হওয়াই ভালো! মুসলমানদের পোশাক পরিচ্ছেদের ধারা ধর্ম জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তৈরি হয়েছে–অন্য দেশের পোশাক, দেশের আবহাওয়া অনুসারে গড়ে উঠেছে। দেশের Climate অনুসারে পোশাক হওয়াই দরকার, তবে প্রত্যেক জাতির রীতি ও পোশাকে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, থাকাও উচিত। ইহুদীদের মতো দেশহীন, জাতীয়তাহীন, পোশাকহীন যাকে দেখে তাকেই অনুসরণ করে, এরূপ হলে মান থাকে না।

তবে একটা কথা, যেখানে নিজের জাতির লোকসংখ্যা অল্প সেখানে যে দেশে বাস করা যায় সেখানকার মতো পোশাক পরাই ভালো। নইলে ইজ্জত থাকে না। যেখানে নিজের জাতি অসম্মানিত সেখানে সুসভ্য, বলবান জাতির পোশাক পরা কর্তব্য। গোড়ামি করে নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে চেষ্টা করলেও কার্যে তা পারা যায় না, অথবা হাসির ও ঘৃণার পাত্র হতে হয়। আবার যে ব্যক্তি অযোগ্য তার উচিত নয়, সুসভ্য উন্নত শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের পোশাক পরে–তাতেও উপহসিত হতে হয়। যে যোগ্য সেই যোগ্য স্থানে বসবে এবং যোগ্য পোশাক পরবে-নিজের মনের থেকেই যোগ্যতার পরিমাপ করা যায়। বড়ও অনেক সময় সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা লাভ করবার জন্যে ছোটদের পোশাক পরেন, যেমন Salvation ইরবহ-র ফৌজেরা বাঙালির শ্রদ্ধা লাভ করবার জন্যে অনেক সময় ধুতি ও শাড়ি পরেন। যারা বিশেষ উচ্চশ্রেণীর লোক, ভিতরে মহত্ত্বের ও আত্ম গুরুত্বের অনুভূতি আছে, তিনি নিজের ইচ্ছামতো পোশাক পরেন। তিনি কারো ধার ধারেন না।

ফিনফিনে অশ্লীল পোশাক পরা বড়ই খারাপ। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ বলে বস্ত্র না পরে থাকবার নয় তবে যথাসম্ভব অল্প এবং রুচিসঙ্গত হওয়া চাই।

.

## ২৪. যুবকদের পিতৃভক্তি

কোনো কোনো যুবকের পিতৃভক্তি মোটেই নেই–সৎ শিক্ষার অভাবে কু-স্বভাবে ছেলেরা ওস্তাদ হয়ে ওঠে।

কৃতজ্ঞ হতে শেখে না। গুরুজনের প্রতি ভক্তিশীল, বাধ্য এবং অনুগত থাকা, তাদেরকে প্রেম করা–এসব সৎ শিক্ষার প্রাপ্তি, তারা পায় না–এসব কু-মাতার কু-শিক্ষার ফল। মা দুধ খাইয়ে দুধ দিয়ে সন্তানগুলিকে অসুর বা পশু করে গড়ে তোলেন, পিতৃভক্তি, গুরুজনে। ভক্তি শিক্ষা দেন না।

পিতার নিন্দা করা, তাকে অশ্রদ্ধা করা, তার আদেশ অগ্রাহ্য করা, অবহেলা করা কুলাঙ্গার নরাধম ছেলের কাজ। পিতার ইঙ্গিত মাত্র তার মনোভাব বুঝে সর্বাগ্রে সেই কাজ করতে হবে। তিনি যে আদেশ করেন, অতিশয় আহ্লাদের সঙ্গে তাই কর। যদি পিতৃনিন্দায় জিহ্বা কলঙ্কিত হয় সে জিহ্বা কর্তন করে ফেল।

যে জোর গলায় পিতামাতার সঙ্গে কথা বলে, সেই বেয়াদব পুত্রের সঙ্গে সংস্রব না রেখে তাকে গৃহ হতে অবিলম্বে তাড়িয়ে দাও।

.

**২৫. যুবকদের সাধারণের সঙ্গে ব্যবহার**

জগতে বিনয়ে নত হয়ে চলাই উচ্চশ্রেণীর লোকের কাজ। অহঙ্কার সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

ব্যবহারের দ্বারা জানতে পারা যায় না, যুবকেরা কোন স্তরের লোক। ভদ্রতায় ও মনুষ্যত্বে যতটুকু কলঙ্কশূন্য হতে পারে, তার চেষ্টা নিতান্তই করবে। সাবধান, যেন পশ্চাতে মনুষ্য তোমাদেরকে নীচ বলে উপহাস না করে।

জীবনে বিবেক ও প্রজ্ঞার বাণী মেনে চলবে, তা হলেই জীবন honourable হবে। যদি কোনো ভালো চাকরি জোটে, সে জন্যে কোনোমতে অহঙ্কারী হয়ো না। তোমার দুঃখী পীড়িত, পতিত পশ্চাদপদ হতভাগ্য বন্ধুদের কথা ভুলো না। যতটুকু পার সাহায্য করবে। ক্ষমতা পেয়ে কখনও তার অপব্যহার করবে না। মানুষকে হঠাৎ বিশ্বাস করবে না; হঠাৎ কাউকে বিশ্বাস করে তার উপর নির্ভর করো না। জীবনে নীচ ও হীন হয়ো না। নিজের লাভের কথাই বেশি ভেবো না, অপরের কথাও ভেবো।

দেশের লোক বড় মিথ্যাবাদী-নৈতিক মেরুদণ্ড এদের নাই। শিক্ষার অভাবে সমস্ত জাতিটা একেবারে নিম্নস্তরে পড়ে আছে। এদের ধর্ম-কর্ম সমস্তই বৃথা। তথাপি আপনার জাতিকে ঘৃণা করতে নেই। যতটা পার প্রদীপ উৎসবের আনন্দ মেলায় যোগ দিও–পথের পার্শ্বে নিজেও দুই একটা প্রদীপ জ্বেলো।

মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে যে সুন্দর সেই প্রকৃত ভদ্রলোক।